খুদে প্রতিভা • নতুন খেলা • আমার স্কুল • আমার কুইজ

৫ মে ২০১৮

আনন্দমেলা

দু'টি জমজমাট গল্প

খে লা ধু লো

ফুটবলে নজর কাড়ছেন মিশরীয় মো

জ্যাভলিনের নতুন তারা নীরজ

সম্পূর্ণ ভূতের কমিক্স

চার বুড়োর আড্ডা

KUNAL 18

PARLE
ভুলে যেওনা!
আমাদের জায়গা কোনো সাধারণ
ক্যান্ডি বা টফি নিতে পারে না!
PARLE mango bite
PARLE Kaccha mango bite
Melody Chocolaty
অন্য কেউ নিতেই পারে না। কিন্তু ওনার অবশ্যই এটা জানা উচিত যে আমের
মত মিষ্টি ম্যাঙ্গো বাইট, কাঁচা আমের মত টাঙ্গি কাচ্চা ম্যাঙ্গো বাইট এবং
চকলেটি মেলোডি-র জায়গা অন্য কোনো ক্যান্ডি বা টফির পক্ষে নেওয়াই সম্ভব নয়!

IPL -এ KKR

Discount Offer!

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য

সাহিত্য বিচিত্রা®

English Companion

বিচিত্রা®

দর্শন

ইতিহাস

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শিক্ষাবিজ্ঞান

মাধ্যমিক

প্রশ্ন বিচিত্রা®

2019

SCANNERPLUS®

Suggestions

বিশেষ ছাড়!

যতদিন IPL-এ KKR ভালো খেলবে ততদিন বিশেষ ছাড়!

সব সেরা সংগ্রহ

আরো সত্যজিৎ ৫০০.০০

সেরা সত্যজিৎ ৬০০.০০

গল্প ১০১ ৬০০.০০

গোঁসাইপুর সরগরম ২০০.০০

গোলাপী মুক্তা রহস্য ২০০.০০

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ২৫০.০০

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা ২৫০.০০

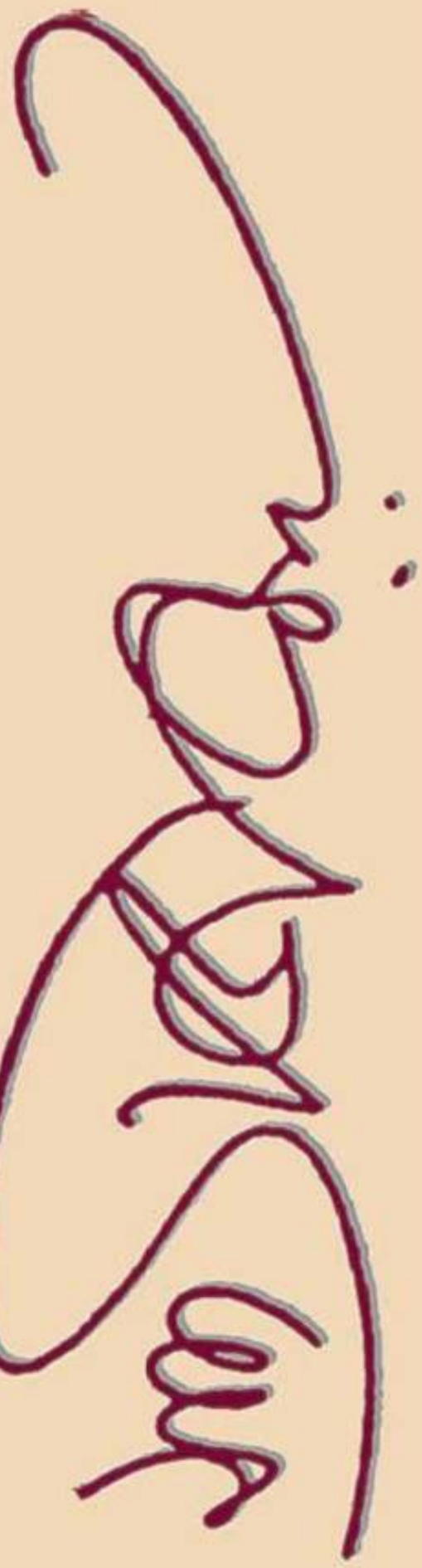

ফেলুদা সমগ্র

দু'খণ্ড একত্রে ১০০০.০০

শঙ্কু সমগ্র ৪৫০.০০

স্মৃতিকথা

যখন ছোট ছিলাম ১৫০.০০

সম্পাদিত গ্রন্থ

সেরা সন্দেশ ৪৫০.০০

চলচ্চিত্র বিষয়ক

অপুর পাঁচালি ২৫০.০০

বিষয় চলচ্চিত্র ১০০.০০

একেই বলে শুটিং ১০০.০০

স্পেশ্যাল ফিল্ম এডিশন

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ২৫০.০০

সিনেমায় ডবল ফেলুদা ২৫০.০০

চিত্রকলা

প্রতিকৃতি ১২৫.০০

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা শতাধিক পোর্ট্রেট

কমিক্স

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য

অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য ১৫০.০০

এবার কাণ্ড কেদারনাথে ১৫০.০০

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা ১৫০.০০

দার্জিলিং জমজমাট ২০০.০০

নয়ন রহস্য ২৫০.০০

নেপোলিয়নের চিঠি ১৫০.০০

বোসপুকুরে খুনখারাপি ২০০.০০

রবার্টসনের রুবি ১৫০.০০

রয়েল বেঙ্গল রহস্য ২০০.০০

শেয়াল-দেবতা রহস্য ১৫০.০০

হত্যাপুরী ২৫০.০০

প্রোফেসর শঙ্কু কমিক্স

ইজিপ্সীয় আতঙ্ক • স্বপ্নদ্বীপ ২০০.০০

একশৃঙ্গ অভিযান ২০০.০০

প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও

১৫০.০০

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা ২৫০.০০

প্রোফেসর শঙ্কু— হাড় • রোবু ২০০.০০

মরুরহস্য • শঙ্কু ও আদিম মানুষ

২০০.০০

মহাকাশের দূত ২০০.০০

মানরো দ্বীপ • আশ্চর্জন্তু ১৫০.০০

রক্তমৎস্য রহস্য • ম্যাকাও ২০০.০০

শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ১৫০.০০

সত্যজিৎ রায় চিত্রিত

ছড়া বিমলচন্দ্র ঘোষ

হাতেখড়ি ৪০.০০

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭ • ই-মেল anandapublishers@gmail.com

আনন্দমেলা

৪৪ বর্ষ ১ সংখ্যা ৫ মে ২০১৮ ২১ বৈশাখ ১৪২৫

সম্পূর্ণ ভূতের কমিক্স

চার বুড়োর আড্ডা ১০

এক বর্ষার বিকেলে মুকুন্দর বাড়িতে তাসের আড্ডা বসেছে। আর তারপরই হল এক ভয়ংকর ঘটনা। কী হল?

কাহিনি: আশাপূর্ণা দেবী **চিত্রনাট্য ও ছবি:** আশিস ভট্টাচার্য

জমজমাট দু'টি গল্প

আবিন দ্বীপের রহস্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪

কোয়াট
অরুণাভ দত্ত ৩৪

ভ্রমণ

সাগরপারের মীনমহল
প্রসেনজিৎ সিংহ ৩২

আশ্চর্য

মেঘালয়ে দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা
অচ্যুত দাস ৩৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিষাবতার
জিৎ সরকার ৪০

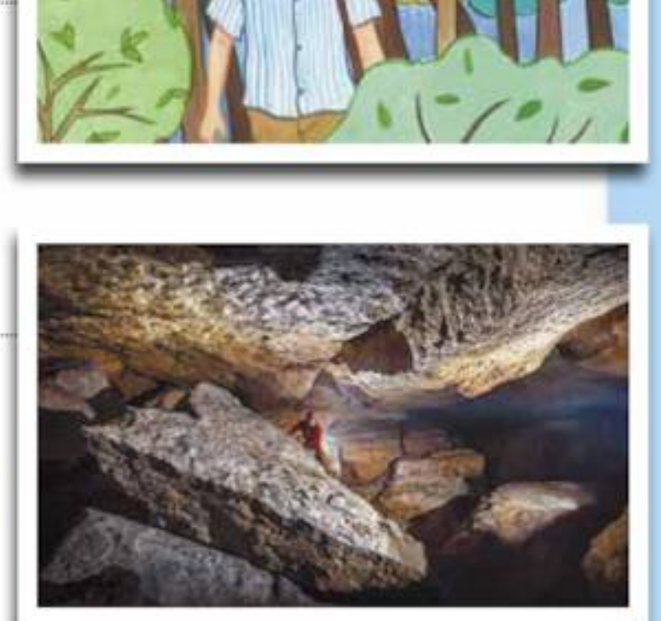

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

সূচিপত্র

নিয়মিত বিভাগ

ফারাক পাও, সুদোকু ৬
আমার কুইজ় ২৩
মজার ঝাঁপি ৪৪
যা হয়েছে, যা হবে ৪৫
খুদে প্রতিভা ৪৬
আমার স্কুল ১ ৪৮
আমার স্কুল ২ ৫০
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৫২
নতুন খেলা ৫৮

খেলাধুলো

নীরজের লক্ষ্যভেদ
সায়ক বসু ৫৪
মিশরের রাজা মো
ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫
ছোট-ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৫৬

প্রচ্ছদ: কুনাল বর্মণ

এগজ়িকিউটিভ এডিটর, বাংলা ম্যাগাজ়িন: পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

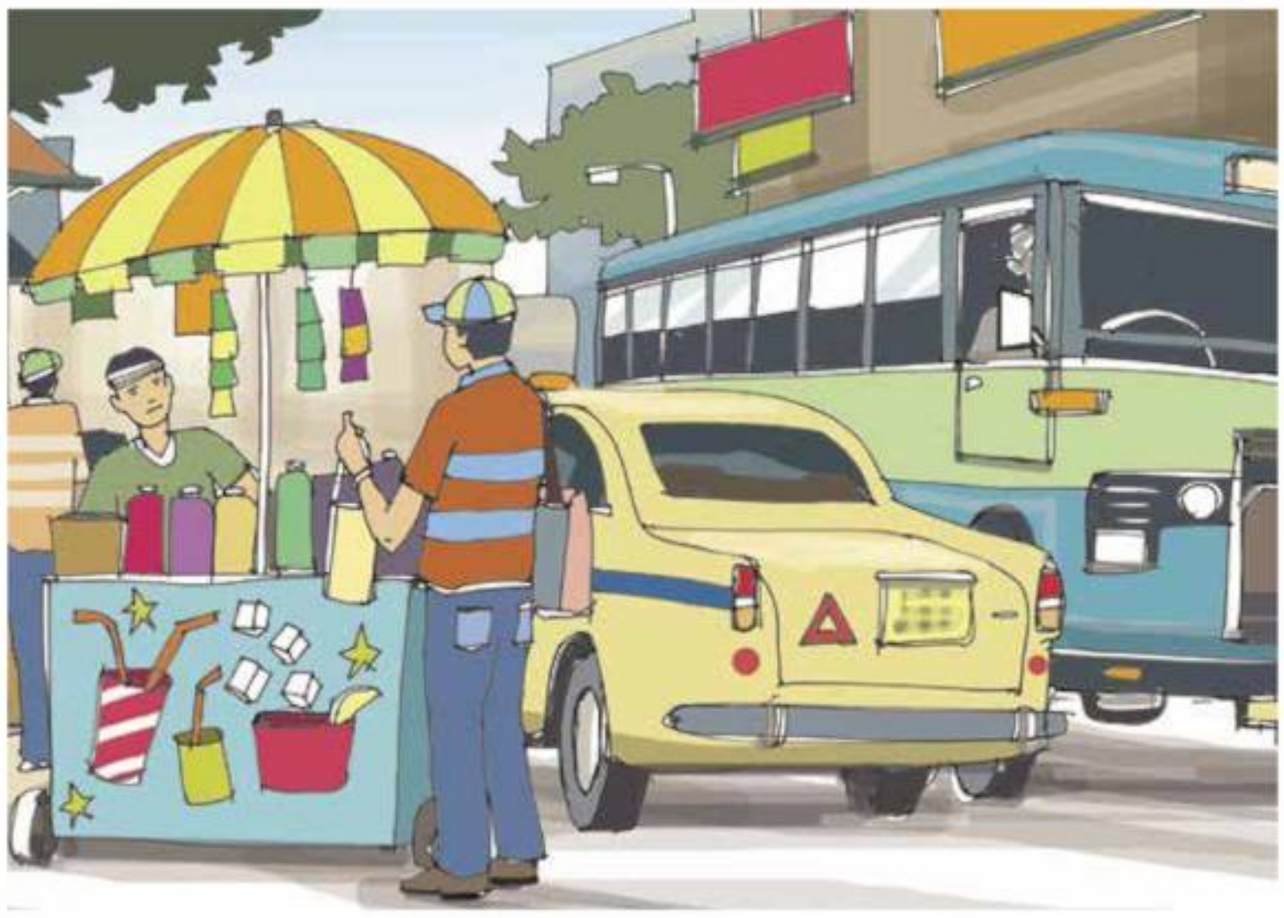

ছবি: প্রীতম দাশ

উত্তর: ২০ মে সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) দোকানের চিপ্‌সের প্যাকেটগুলোর রং বদলে গিয়েছে।
২) লাল গাড়ির লুকিংগ্লাস নেই।
৩) দোকানে রাখা জারের রং বদলেছে।
৪) উপরে একটি বাড়িতে জানলা কম আছে।
৫) দূরের বাড়ির ছাদের লাইটপোস্টটি নেই।
৬) লাল গাড়ির ছাদের উপর একটি ব্যাগ নেই।
৭) দোকানের চালে আলোটি স্থান পরিবর্তন করেছে।
৮) ছবিতে সবচেয়ে বাঁ দিকের পতাকা রং বদলেছে।

সুদোকু

৪								৬
		৯		২		৮		
	৬		৯	৫	৪		৭	
	৪	১	৮		৫	৭	৩	
	৩	৫	৪		১	৬	২	
	৫		৬	৯	৩		৮	
		৬		৮		৯		
৭								১

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

১	৯	৮	৬	৪	৩	৫	২	৭
২	৪	৫	১	৮	৭	৬	৯	৩
৬	৩	৭	২	৫	৯	৮	১	৪
৯	৫	৬	৮	১	৪	৩	৭	২
৭	১	৩	৯	৬	২	৪	৫	৮
৮	২	৪	৭	৩	৫	৯	৬	১
৪	৭	৯	৩	২	৬	১	৮	৫
৩	৬	১	৫	৭	৮	২	৪	৯
৫	৮	২	৪	৯	১	৭	৩	৬

OSHEA HERBALS

এটি সহায়ক :
- চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে।
- মজবুত ও স্বাস্থোজ্জ্বল চুল তৈরি করতে।

এটি সহায়ক:
- খুশকি নাশ করতে।
- চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে।

THERE'S *always* A REASON *to smile*

এটি সহায়ক:
- চুল পড়া কম করতে।
- চুলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে।
- দুর্বল চুলের যত্ন নিতে।

GainHair NATURALLY

NON OILY FORMULATION

ENRICHED WITH

- ✓ Follicusan
- ✓ Milk Protein

PhytoGAIN
HAIR VITALIZER

Non Oily | Natural and Safe | For Men & Women | A Water base Formulation

*Result may very from person to person

OSHEA HERBALS

For Better results use : **AMLACARE** Hairfall Control Shampoo

ALSO AVAILABLE PhytoGAIN Hair Oil

HELPLINE: 033 40433333 (10am to 7pm) | **Whatsapp :** 9674888884 | **Email:** care@osheaherbals.com
TV PROGRAMME: ZEE BANGLA : Sampurna - 11am Saturday | **CTVN** : Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm
Products also available at: **www.osheaherbals.com** | Available at leading cosmetic & medical outlets

আমার স্কুলের খুদে প্রতিভা

আনন্দমেলা নিয়ে এল নতুন প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় তোমরা লিখে এবং এঁকে পাঠাতে পারবে। সেরা প্রতিভাদের জন্য থাকবে আকর্ষক পুরস্কার। তবে পত্রিকার পাতায় যে 'খুদে প্রতিভা' বিভাগটি রয়েছে তার সঙ্গে এই বিভাগের সামান্য ফারাক রয়েছে। এই বিভাগটিতে শুধু সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে, যে স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। নীচে সেইসব স্কুলের তালিকা দেওয়া হয়েছে। আর নিজের লেখা, আঁকা সরাসরি পত্রিকা দফতরে পাঠাতে হবে না। জমা দিতে হবে স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। এখানে লেখা বলতে কোনও গল্প, কবিতা, ছড়া, নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ সবই লেখা যাবে। শব্দ সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০ শব্দ।

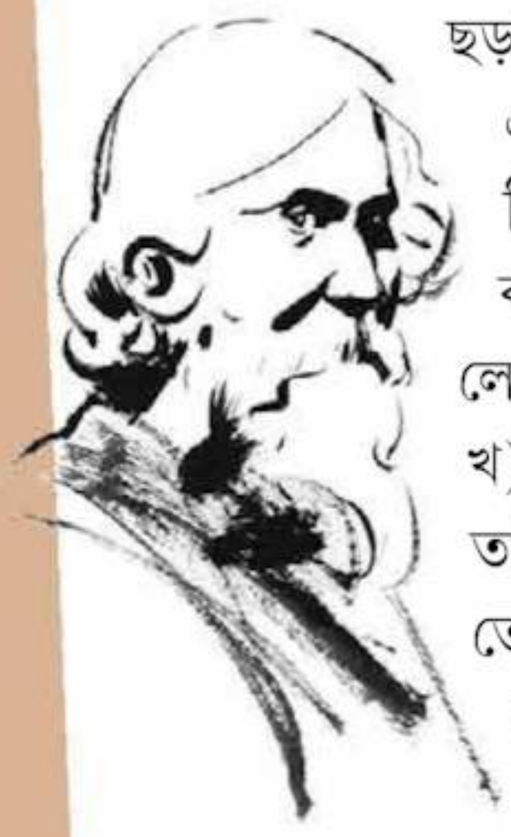

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় হল, **'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'**। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম:

ক) একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী মাত্র একটাই লেখা কিংবা ছবি পাঠাতে পারবে। একাধিক লেখা, ছবি কিংবা একটা লেখা সঙ্গে একটা ছবি পাঠালে সেটা মনোনীত হবে না।

খ) লেখা, ছবি যদি স্কুলে জমা না দিয়ে সরাসরি পত্রিকা দফতরে পাঠানো হয়, তা হলে সেটা অমনোনীত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তোমরা যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারছ না, তারা মন খারাপ কোরো না। এই প্রতিযোগিতা আবার হবে। হয়তো দেখলে তোমার স্কুলেই হবে। আর যদি তুমি চাও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে, তা হলে তোমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলো, আনন্দমেলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

• হোলি চাইল্ড স্কুল, কলকাতা • খড়িবেড়িয়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, বজবজ • যাদবপুর এন কে পাল আদর্শ শিক্ষায়তন, কলকাতা• পাঠ ভবন, কলকাতা• বি ই কলেজ মডেল স্কুল, শিবপুর, হাওড়া • সৈদাবাদ মণীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বহরমপুর • ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা • গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা • শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া • সাঁতরাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া • শিশু নিকেতন, বর্ধমান • বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান • রবীন্দ্রনগর গার্লস এইচ এস স্কুল, শিলিগুড়ি

নাম: .....

ক্লাস: ..... সেকশন: .....রোল নম্বর: .....

যোগাযোগের নম্বর: .....

স্কুলের নাম: .....

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

আপনি কি এখনও চিন্তা করছেন ?

আপনার ও আপনার পরিবারকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন...?

ব্যবহার করুন কোটি-কোটি# ভারতবাসী দ্বারা ব্যবহৃত একমাত্র ভরসা...

JOLLY

তুলসী 51 ড্রপস্

এক প্রাকৃতিক ও শক্তিশালী ইমিউনিটি বুস্টার

প্রকৃত অভিজ্ঞতা

শঙ্করলাল রাঠি

আমার নাম শঙ্করলাল রাঠি, আমি মহেশ হাসপাতাল, জয়পুর, রাজস্থানে থাকি। আমি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে নিয়মিতভাবে জোলি তুলসী **51** সেবন করতে শুরু করলাম আর তারপরেই খুব আশ্চর্যজনকভাবে দারুণ সুফল পেলাম। আমার **30-35** বছরের পুরনো কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেলাম আর তার সঙ্গে-সঙ্গে দুশ্চিন্তা থেকেও রেহাই পেলাম।

পাঁচ ধরনের তুলসীর সংমিশ্রণে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি নির্যাস

''জোলি তুলসী **51** ড্রপস্''-এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে বাজারে একইরকম দেখতে অনেক প্রডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে, তাই কেনার সময় 'তুলসী' নয় আসল ''জোলি তুলসী **51** ড্রপস্''-ই কিনুন।

সমস্ত মেডিক্যাল স্টোরে পাওয়া যায় | 0161-5201571

চার বুড়োর আড্ডা

কাহিনি: আশাপূর্ণা দেবী
চিত্রনাট্য ও ছবি: আশিস ভট্টাচার্য

গ্রামের নাম মজিলপুর। সকাল থেকে আকাশ থমথমে মেঘলা। বিকেল হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মুকুন্দর বাড়িতে তিন বুড়ো, হরিহর, গদাধর আর স্বয়ং মুকুন্দ ছটফটিয়ে উঠল...

সেরেছে, বনমালী আসতে পারলে হয়।

না-না, আসবে ঠিকই।

আড্ডায় আসেনি, এমন কোনওদিন হয়েছে?

থাম তো! এখন কী বলে, তাতে তোর কী? তোর যা জানা, তাই বল।

তা কত আর? আধমাইলটাক। ওর কাছে নস্যি। তবে কাল যেন বলছিল, ক'দিন ধরে হাঁটুতে বড় ব্যথা, যন্ত্রনা।

সে হয়নি, আজন্মকাল গায়ে-গায়ে থাকার জন্য। চারজনই দু'মিনিটের রাস্তায়। বনমালীর মতিভ্রম ঘটল। এই শেষ বয়সে কিনা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পেয়ে সাতপুরুষের বাড়িঘর ফেলে সেখানে সামলাতে গেল। এখান থেকে ক'মাইল রে গদাধর?

এখন তো আর মাইলফাইল বলে না রে, কিলোমিটারফিটার কী যেন বলে!

তাই যখন, তখন একটু সময় থাকতে বেরিয়ে পড়লেই হত। সকাল থেকেই তো আকাশের অবস্থা দেখছিস। কী এত রাজকার্য তোর?

ওর শ্বশুরবাড়ি থাকতে যাওয়ার মন ছিল না রে হরিহর!

বউ-ছেলেমেয়েদের তো বলেওছিল, 'তোমরা থাকো গে, আমি এখানে বেশ থাকব।'

কাছেই তো! দুপুরে গিয়ে না হয় খেয়ে আসত। রাতে তো খাদ্য খই-দুধ, সে এখানেই হয়ে যেত। দক্ষর মা আছে, এত বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি... তা ওরা রাজি হল? বলল, 'পাগলের মতো কথা বোলো না।'

ওই সম্পত্তি পাওয়াটাই কাল হল।

আহা, ছেলেমেয়েদুটো তো আহ্লাদে উর্ধ্ববাহু হয়ে নেচেছিল। তাদের তো হাল ফিরল। সম্পত্তি তো কম নয়...

...জমি, বাগান, পুকুর, গোয়ালে গোরু, উঠোনে গোলা ভরা ধান। তায় আবার বাড়ির কাছে সিনেমা হল।

ওর কোনটা কাজে লাগবে? পেটরোগা মানুষ! রাতে তো খায় একছটাক দুধে একটু খই ভিজিয়ে আর দিনে একটু শিঙিমাছের ঝোল আর গলা-গলা ভাত।

সে কথা কে বুঝছে? বয়স হলেই পরাধীন। একদিন এই বনমালী যখন রেল আপিসে কাজ করত? ছুটিছাটায় বাড়ি এলে...

...গুষ্টিসুদ্ধ সবাই থরহরিকম্প!

এখন সকলেরই এক অবস্থা।

মুকুন্দ, আর বলিসনে। তোর না আছে বউ-ছেলে, না আছে সংসার। পিসিমা যাওয়া পর্যন্ত তো মুক্তপুরুষ তুই। পিসি কি কম দিন গিয়েছে? পিসির মেয়েটাই তো তোকে খাওয়াচ্ছে।

আজন্মের বন্ধু এই চার বুড়ো সুখেই দিন কাটায়।

ছেলেবেলায় ইশকুল পালিয়ে ফলপাকুড় চুরি থেকে একটু বড় হয়ে পরের পুকুরের মাছ ধরতেও একেবারে একাত্মা। পাড়ার লোক ওদের দু'জোড়া মানিকজোড় বলত।

এখন ওদের ক্ষমতা গিয়েছে। তবু সারাটা দিন ধরে ছটফট করতে থাকে সন্ধেবেলার এই তাসের আড্ডার জন্য। চারজনে এক হলে যেন কী এক পরম পাওয়া পেল। কিন্তু আজ বনমালী আসছে না কেন?

চিরদিনের হাড়মুখ্যু!

আকাশটা তো দেখছিস সকাল থেকে!

দু'ঘণ্টা আগে বেরলেই বা কী হত? চল, বাইরে গিয়ে দেখি...

নাঃ। মাটি করেছে। বিষ্টিটা বেশ জোরেই এসে গেল।

হঠাৎ

ওই! ওই তো আসছে! হুঁ বাবা! বলেছি না, পৃথিবী উলটে গেলেও, আসা রদ হবে না।

গদাধর খুশি

মুকুন্দও খুশি

আশ্চর্য! ছাতা মাথায় নেই...

খালি মাথায় ভিজতে-ভিজতে আসছে...

আহ, তুই আবার কেন কষ্ট করে... যা ভেজার তো ভিজেইছি!

তা হোক। চোখে দেখে স্থির থাকা যায়? কিন্তু ছাতা নিয়ে বেরসনি কী বলে?

ঢের চেষ্টা করলাম। হল না!

তা হঠাৎ সেই হালকা ছাতাখানা ঝোড়ো হাওয়ায় হাত ফসকে উড়ে গিয়ে ঘোষের পুকুরে পড়ল!

... বেরিয়েছিলাম। নাতনি তার শৌখিন ছাতাখানা দিল হাতে।

অবশেষে

এসে গিয়েছে! এসে গিয়েছে!

বলিস কী? ভিজে টুসটিস করছিস। কেন আপত্তিটা কীসের?

আহা, এখন ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে, গা-মাথা মুছে আমার শুকনো জামাকাপড় পরে গুছিয়ে বোস।

না না, বেশ আছি। গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে।

কে আবার তোর জামাকাপড় ফেরত দিতে আসবে?

কেন? তুই-ই আসবি।

বনমালী বাঁধানো দাঁতে বোকাটে হাসি হাসে। ওর মুদ্রাদোষ!

কাল এত বিষ্টি পড়বে? তোরটা কাচিয়ে শুকিয়ে রাখব, আমারটা দিয়ে তোরটা নিয়ে যাবি। সমস্যাটা কোথায়?

তাই? আসলে... আচ্ছা, দিচ্ছিস দে।

যাক, শেষ পর্যন্ত এল তা হলে।

কাপড়গুলো ধর। পাশের দালানে গিয়ে পালটে নে।

দ্যাখ কাণ্ড! এখন বিষ্টিটা ছেড়ে গেল।

বৃষ্টি থেমেছে; পৃথিবীতে এখন থাকবে শুধু এই একখানা মস্ত চৌকি, চারটে বুড়ো আর একজোড়া তাস। ছেলেবেলায় গরমের দুপুরে পাড়ার মা-কাকিমাদের যে নিত্য তাসের আসর বসত, সেখানে কাছ থেকে ঘেঁষে বসে দেখে শেখা সাবেকি দু'কড়ি সাতের খেলা। আজকের ছেলেমেয়েরা এই জোলো খেলা আর সেজন্য চার বুড়োর হনফনানি দেখে যতই হাসুক এরা নিজেদের আনন্দেই মশগুল...

থপ থপ

যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত এলি। ভাবছিলুম আজকের আড্ডাটা বুঝি ফসকে গেল।

ফসকাবে মানে! এ হে হে ভিজে গিয়েছে। যাক গে, ভিজেই সই।

ফর্‌ ফর্‌

নস্যির কৌটো তোর ট্যাঁকে গোঁজা থাকে। ভিতরের নস্যি ভিজল কীভাবে?

ওই তো খুড়োর কলে পড়ে গিয়েই তো... যাক গে, তাস সাজা।

আজ না এসে থাকতে পারা যেত? কাল মুকুন্দ, তোর কাছে হেরে মরেছি না?

...শেষ পিঠে হঠাৎ রংয়ের টেক্কা তুরুপ মেরে ছক্কা দিয়ে বসলি!

আজ তার শোধ নিতে হবে না?

আজও তা হলে একই পার্টনার?

নিশ্চয়ই! অ্যাই মুকুন্দ, ওখানে করছিস কী?

কিছু না, তোর ভিজে জামা-কাপড়গুলো মেলে রাখছি। তাস দেওয়া হল?

কখন!

রংটা কী হল?

চিড়িতন! চিড়িতনের সাহেব।

সেরেছে! চিড়িতন!

ওটা আমার চিরকেলে অপয়া! দেখি কী হাত?

‘...রাত হয়েছে। ‘কালকে এর শোধ নেব’ বলে বনমালী যতই তড়পাক, আজ কেমন যেন ওর অন্যমনস্ক ভাব। বেশ দু’-একবার ভুলই করে বসল খেলায়। তবে পার্টনার মুকুন্দর কারসাজি সামলে উঠে জিতেই গেল ওরা। এ-খেলায় দু’জোড়া তাস লাগে না। পয়সা দিয়ে বাজি ধরাধরিও নেই। আছে এক অনাবিল আনন্দ। তারপর...

যাক বাবা!

বাঁচা গেল!

হেরো হয়ে আর মরতে হল না। আচ্ছা...

আরে, চলে যাচ্ছিস যে! পিসির মেয়েটা এক্ষুনি চা, মুড়ি, ফুলুরি নিয়ে আসবে।

তোরা খাস।

আরে এই, তোর নস্যির কৌটোটা যে পড়ে রইল...

সে গুড়ে বালি!

কেন, তোর কী এত তাড়া? গিন্নি বকবে?

বুনোটার (বনমালী) আজ যেন কেমন বেভাব...

কেমন অন্যমনস্ক, অন্যমনস্ক...

তাই মনে হল। বাড়িতে বকাবকি হয়েছে বোধ হয়।

বাড়ির বকাবকিকে ও ভারী কেয়ার করে। শরীরটাই বোধ হয় জুতসই নেই।

হতে পারে। আমরাও তা হলে এবার চলেই যাই।

কেন? তোদের এত কী তাড়া?

এই তো সবে আটটা কুড়ি। তোদের তো আর মাঠ ভেঙে এক মাইল যেতে হবে না।

মুড়ি, তেলেভাজা নিয়ে পিসির মেয়েটা এল বলে!

মুড়ি? বলছিস? তা হলে বসেই যাই আর একটু?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ততক্ষণ না হয় গোলামচোর খেলাই চালিয়ে যাওয়া যাবে ছেলেবেলার মতো।

হা-হা-হা! গাবু খেলা।

একটু বাদে

দুম দুম

মুড়ি-ফুলুরি! কিন্তু এত জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে! দেখি...

তোমরা...!

তোমরা কে বাবা?

আমাদের চিনতে পারছেন না?

না তো... ঠিক...

তা চিনবেন না। আমরা ও-পাড়ার সিনেমা হলের পাশে থাকি।

দাদুরা কি এখনও তাস পেটাচ্ছেন? আচ্ছা লোক তো মশাই আপনারা!

চারজনের আড্ডার একজন যে আজ এল না, তার জন্য প্রাণে একটু ধড়ফড়ানি আসেনি?

এল না মানে? বনমালীর কথা বলছ তো?

এই তো তাস খেলা সেরে একটু আগে চলে গেল।

কী! কী বলছেন দাদুরা? একটু আগে?

হ্যা হ্যা হ্যা...

তাস খেলে উঠে গেলেন বনমালী বাঁড়ুজ্যে!

দাদুরা কি সন্ধেবেলা থেকেই ঘুমের ঘোরে ঝিমোন?

খ্যা খ্যা...

লোকটা তো সেই বিকেলবেলা ঘোষের পুকুরে ডুবে এখন মারা গিয়ে বাড়ির উঠোনে শুয়ে! ওঁর স্ত্রী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আপনারা নাকি ওর চিরকালের প্রাণের বন্ধু, তাই শেষ দেখা দেখতে...

কী? অসভ্য, বেয়াদপ, ইতর ছোকরারা! যা মুখে আসছে বলে চলেছ? ইয়ার্কি মারার বিষয় পাওনি? একটা জলজ্যান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাকে মেরে পেট ফুলিয়ে উঠোনে শুইয়ে রেখে... ছি ছি...

ছি ছি, নরকেও ঠাঁই হবে না তোমাদের!

বটে? তা হলে চললুম। আপনাদের খবর দিতে বললেন নবগোপালের ঠাকুমা, তাই আসা... শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে হলে যান চটপট! নইলে পুলিশ লাশ মর্গে চালান দেবে। অপঘাতে মৃত্যু তো! চল সবাই।

ব্যাপারটা কী বল তো?

কী আবার? বদমাশদের বদমায়েশি! মজার নতুন ফন্দি। আমরা ভয় পেয়ে ছুটতে-ছুটতে যাব আর ওরা তখন দাঁত বের করে হাসবে।

তা হোক, তবু একবার যাওয়া যাক।

গিয়ে কী হবে? ওদের মজার হাসি দেখতে?

কিন্তু এত সব বলল। যদি সত্যি মর্গে চালান... শেষ দেখাটা...

যদি মর্গে চালান দিয়ে বসে? জলজ্যান্ত লোকটাকে?

নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করব, না ওই ফক্কড়দের কথা?

সেও তো কথা! নস্যির কৌটোটা তো এই চোখের সামনেই চকচক করছে।

খাঁটি রুপোর জিনিস। অফিসে রিটায়ার করার সময় ফেয়ারওয়েলে দিয়েছিল।

'দিকে পাড়ার লোকেরা মুকুন্দর দরজায় এসে ভেঙে পড়েছে।

বামুনজ্যাঠার খবর শুনলেন?

বামুন দাদুর খবর শুনলেন?

নবুর ঠাকুরদার খবর শুনলেন?

কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! হায়! হায়!

শুনলাম, বাড়ির লোকের কথা না শুনে 'বিষ্টি আসছে' বলে বেলা তিনটের সময় আপনাদের এই আড্ডায় আসছিলেন! হঠাৎ কী করতে যে পুকুরধারে গেলেন!

বটে! তাকিয়া রোজ ঝাড়া হয়। ওই ভিজে জামা-কাপড়গুলো... ওই ঝুলপাড় বাবুধাক্কা দেওয়া ধুতি...

ওরে, শুনেছি এমন হয়। হঠাৎ ঘটলে সদ্য মৃতরা আপনজনদের একটু দেখা দিতে যায়।

ও তো আমাদের নয়... বনমালীর নাতি ওটা ওকে উপহার দিয়েছিল...

নস্যির কৌটো? ও কিছু না,হয়তো কালকেই ফেলে গিয়েছিল। তাকিয়ার তলায় পড়ে ছিল।

ওসব জামাকাপড় দাদু, আপনারই। সকালে চানের সময় ছেড়েছিলেন। বাদলা দেখে কাজের লোক কাচেনি। পড়ে আছে তাই।

বেশ। তাই যদি হবে, তবে ওই নস্যির কৌটোটা...

আসছে-আসছে ভেবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর ওই ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছেন, এসেছিল, খেলে গিয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো...

কে শোনে কার কথা? যে মানুষটাকে বেলা পাঁচটায় পুকুর থেকে টেনে তোলা হয়েছে, সে লোক সন্ধে সাড়ে ছ'টায় এদের সঙ্গে তাস খেলে গিয়েছে, একথা কে বিশ্বাস করবে? এ তো নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হল! অথবা অলৌকিক কোনও কাণ্ডকে বিশ্বাস করতে হল! তিনঘণ্টা ধরে তাস পিটে গেল কে? 'এই মারলাম টেক্কা! এই দিলাম তুরুপ!' বলে হুঙ্কার ছাড়ল কে? কার মৃতদেহ তুলে কার নাম করছে এরা?'

অবশেষে মুকুন্দরা বনমালীর ছাড়া জামাকাপড়গুলো গামছায় বেঁধে, রাগে, দুঃখে, অপমানে আর বিভ্রান্তিতে রওনা দিল বনমালীর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে।

এই মুকুন্দ! অত ছুটছিস কেন? আমি তাল দিতে পারছি না!

ভিজে ধুতিখানা দেখেই বনমালীর গিন্নি ডুকরে কেঁদে উঠল

ও গো, হ্যাঁ গো! এই কাপড়টা পরেই বেরিয়েছিল গো!

এই সরু নরুনপাড় চটের মতো মোটা খেঁটে ধুতি সাতজন্মে পরেছেন উনি? ও গো সেই যে বলে, মরা মানে নতুন কাপড় পরা! এ তাই নাকি? হায়-হায়!

হায়! হায়! যাক গে, গিয়ে এরকম কাপড় পরতে হবে তোমায়?

একটু পরেই..

কখন দেখা গিয়েছিল পুকুরে ভাসতে?

আজ্ঞে, বেলা পাঁচটা নাগাদ।

কে প্রথম দেখেছিল?

রাখাল বাছুর খুঁজতে গিয়ে দেখে, জলের মধ্যে কী দাপাদাপি করছে!

বাছুর ভেবে ঝাঁপিয়ে ঠ্যাং ধরে টানতে শুরু করে। ওটা বনমালীর একটা হাত! ও চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে।

মাছধরা ছেলেরা এসে তোলে। ছাতার বাঁট ধরা... ছাতার কাপড় ভিজে, ছেঁড়াখোঁড়া...

বুড়ো নাতনির ছাতাটা বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল।

বনমালীর নাকের উপরের আঁচিলটাই ভেঙে দিল সব বিভ্রান্তি। দেহটি বনমালীরই। জলে ডুবে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এল তিন বুড়ো।

আজ রাত্তিরে আর তোর একা এ-বাড়িতে শুয়ে কাজ নেই মুকুন্দ, আমরা দু'জনা থাকি।

থাকবি? তা থাক।

দরজা খুলে...

হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ, তিনজনই চেঁচিয়ে উঠে সপাটে মাটিতে। জ্ঞান হারানোর আগে ওরা দেখতে পেয়েছিল

খি খি খি খি দুঃখু করিস না, আড্ডা ভাঙবে না। আসব রোজ।

স মা প্ত

আমার কুইজ়

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন ‘দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স’-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হাট’ কবিতায় বক্সীগঞ্জে একটি নদীর তীরে হাট বসত। বর্তমানে এই বক্সীগঞ্জ কোথায় অবস্থিত?

2 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে বহু আন্তর্জাতিক টেক কোম্পানির প্রধান অফিস। আমাদের দেশের কোন শহরকে ‘সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া’ বলা হয়?

3 প্রাচীন ভারতের অন্যতম যেসব স্থাপত্য কিংবা নির্মাণ আমাদের গর্বের, তার মধ্যে অন্যতম ইলোরা গুহাচিত্র। এটি ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

4 আমাদের দেশের সমস্ত নোটেই একজন মানুষের সই থাকে, কখনও খেয়াল করে দেখেছ কি? খোঁজ নিলে জানতে পারবে, সইটি রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সই। কিন্তু সমস্ত নোটে ওই সইটি থাকে না। বরং একটি বিশেষ নোটে সই থাকে আমাদের দেশের অর্থ সচিবের। বলতে পার, সেই নোটটি কত টাকার নোট?

5 এবছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ‘নগরকীর্তন’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেলেন কোন বাঙালি অভিনেতা?

6 বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন কোন মুঘল সম্রাট প্রচলন করেছিলেন?

7 সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। বলতে হবে, তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত পুত্রের নাম কী?

8 দিল্লির কোন ভবনটির স্থাপত্যকার এডুইন লুটিয়েন্স এবং হারবার্ট বেকার?

9 কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কাবুলিওয়ালা কোন দেশের লোক ছিল?

10 প্রথমবার বাংলায় যে কুইজ় শো পরিচালনা করা হয়েছিল, সেটি হয়েছিল কলকাতা শহরে। ১৯৬৭ সালে। বলতে হবে, সেটি পরিচালনা করেছিলেন কে?

৫ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

১) অ্যামিওট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস।
২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩) রজার ফেডেরার।
৪) ভারত-চিনের সীমারেখা লাইনের নাম ম্যাকমোহন লাইন।
৫) বাণভট্ট।
৬) দীপিকা পাল্লিকল।
৭) রাবণ।
৮) লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম।
৯) ইন্ডিয়া।
১০) প্যারিস, ফ্রান্স।

সঠিক উত্তরদাতা

অলিভিয়া মিত্র, *পঞ্চম শ্রেণি, কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর।* **অনিকেত সেনগুপ্ত**, *সপ্তম শ্রেণি, সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়, রায়গঞ্জ।* **তথাগত ঘোষ**, *দশম শ্রেণি, মাজিনান নব বিদ্যালয়, হুগলি।* **ঋদ্ধিমান সাহু**, *পঞ্চম শ্রেণি, ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।* **ইমন পড়িয়া**, *পঞ্চম শ্রেণি, পাঁশকুড়া বি বি হাই স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর।* **দিমিত্র চক্রবর্তী**, *সপ্তম শ্রেণি, সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠ, কলকাতা।* **দেবজিৎ সেনগুপ্ত**, *একাদশ শ্রেণি, সেন্ট পল্‌স স্কুল, জলপাইগুড়ি।* **আর্তি মণ্ডল**, *অষ্টম শ্রেণি, গুসকরা বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান।* **অর্হণ জানা**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, স্প্রিংডেল হাই স্কুল, কল্যাণী, নদিয়া।*

উত্তর পাঠাও ২৮ মে-র মধ্যে। আমাদের ঠিকানা ‘আনন্দমেলা আমার কুইজ়’ বিভাগ।
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।

গল্প

আবিন দ্বীপের রহস্য

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে জেট এয়ারলাইন্সের বিমানটি ডেইজ়িদের নিয়ে যখন আকাশে উড়ল তখন মধ্যরাত্রি। মাঝপথে আলোর শহর সিঙ্গাপুরে সাময়িক বিরতি, তারপর আবার প্লেনে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ। পরদিন ডেইজ়িরা যখন ডনপাসার নাগুরারাই বিমান বন্দরে পৌঁছল ঘড়িতে তখন বেলা একটা কুড়ি।

ইন্দোনেশিয়া মানেই বিশ্বসেরা বরোবুদুর বৌদ্ধস্তূপ, বাটাভিয়া মিউজ়িয়াম, কিন্তামান জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ইন্দোনেশিয়া মানে কেরাটন প্রাসাদ, চোখধাঁধানো শহর জাকার্তা। ডোরা এর আগেও ইন্দোনেশিয়ায় পর্যটকদের নিয়ে এসেছে, তবে এবার তার সঙ্গে দুই বেস্ট ফ্রেন্ড, দামিনী আর ডেইজ়ি।

এয়ারপোর্টের বাইরে আসতেই দামিনী আনন্দে বলে ওঠে, "ওয়াও! ওয়ান্ডারফুল! হিন্দু স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, থ্যাঙ্কস ডোরা!"

ডেইজ়ি ওর গায়ে টোকা দিয়ে বলে, "এই যে দিদিমণি, বকবক না করে জোরে পা চালান। টুরিস্টরা এগিয়ে গিয়েছে।"

"ওই তো আমাদের গাড়ি। হান্তাবালু প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই আমাকে ফলো করুন," বলে ডোরা এগিয়ে যায়। গন্তব্য হোটেল কেঞ্চকির। ঝাঁ চকচকে রাস্তা, দু'দিকে পাম জাতীয় গাছের সারি। মাঝে-মাঝে কটেজ, ভিলেজ এরিয়া। গাড়ি ছুটে চলেছে সত্তর-আশিতে।

"এই ডোরা, ইন্দোনেশিয়ার সাইট সিয়িং কী-কী আছে বল না।"

দামিনীর কথায় ডেইজ়ি বিরক্ত হয়ে বলে, "তোকে প্লেনে আসতে-আসতে দশটা ফেমাস স্পটের পিকচার দেখালাম। এর মধ্যেই ভুলে গেলি?"

"বরোবুদুর আর বাটাভিয়া মনে আছে। আরে, অত কি মাথায় থাকে!"

"তা হলে কী থাকে মাথায়? মাটন কাবাব, চিকেন দোপেঁয়াজ়া?"

গাড়ি এসে থামে সুদৃশ্য হোটেল কেঞ্চকিতে। টু বেড সুট। লিস্ট অনুযায়ী

পর্যটকেরা ঘরে ঢোকে।

দামিনীদের রুম নাম্বার থার্টি ওয়ান দেখিয়ে ডোরা পর্যটকদের ঘরে যায়।

ডেইজ়ি ঘরে ঢুকে ল্যাপটপ চার্জে দেয়। লাগেজ খুলে টাওয়েল, ক্রিম, পারফিউম, ড্রেস বের করে। ফ্রেশ রুমটা একবার দেখে সোফায় বসে।

এর মধ্যে ডোরা ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢোকে।

"কী রে, তুই আমাদের রুমে? টু বেডে তিনজন হবে কী করে?"

দামিনীর কথায় ডোরা দৌড়ে এসে ওর গাল দুটো টিপে বলে, "কী হিংসুটে তুই! পাজি, মর্কট। আমি এ-ঘরেই থাকব। তোর তাতে কী?"

"কিন্তু তিনজন একসঙ্গে ধরবে? যদি পড়ে যাই! দেখ ডেইজ়ি, এতটুকু সিমপ্যাথি নেই, বাবা-মায়ের ওনলি ওয়ান লাডলি।"

"আরে তোরা থামবি? দুটোতে একসঙ্গে হলেই ব্যস," বলে ডেইজ়ি ল্যাপটপ অন করে। দামিনী ওয়াশ রুমে যায়। ডোরা লাগেজ খুলে হ্যাঙ্গারে রাখে।

ডোরা, ডেইজ়ি, দামিনী তিন বন্ধু। ফেসবুক ফ্রেন্ড। তিনটে কমন ফ্যাক্টর নিয়ে ওদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এজ সেম, সেম আলফাবেট 'ডি' দিয়ে নাম শুরু আর তিনজনেরই স্কুলিং এক।

হোটেল বয় এসে লাঞ্চ রেখে যায়। ম্যানেজার চেক করতে আসে। ডোরা কথা বলে। ডেইজ়ির এসব কোনও খেয়াল নেই। ল্যাপটপে সাইট সিয়িং দেখছে।

"এই যে গোয়েন্দাবুড়ি, সেই যে বসেছিস, আর ওঠার নাম নেই। চারটেয় গাড়ি আসবে। তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নে," ডোরা তাড়া মারতেই ডেইজ়ি বলে, "এই ডোরা, ইন্দোনেশিয়ার নর্থ-ইস্টে আবিন বলে একটা অদ্ভুত দ্বীপ আছে। দিনের বেলায় রঙিন, সন্ধে হলেই সাদা— কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো!" ডেইজ়ির কথায় ডোরা থমকে দাঁড়ায়। বলে, "কী নাম বললি?"

"আবিন!"

"আরে হ্যাঁ, এক তান্ত্রিক নাকি মন্ত্র দিয়ে দ্বীপের সবাইকে বশ করে রেখেছে। ভাবছি, একবার দেখব।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এইবার মনে পড়েছে। তুই ওই ভূতুড়ে দ্বীপ আবিনের কথা বলছিস? এই হোটেলের এক ওয়েটারের বাড়ি ওখানে। ছেলেটি নিজেও বাড়ি যায় না। হোটেলে থাকে।"

দামিনী ফ্রেশ হয়ে সেজেগুজে এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। বলে, "এই, তোদের খিদে-ঘুম কিছু পায় না? এখন ওই দ্বীপটিপ নিয়ে কথা থাক। আগে খেয়ে নিই।"

ডোরা উঠে টেবিলে যায়। বলে, "এই যে লেডি ফেলুদা, ল্যাপটপ রেখে আগে খেয়ে নে। আমারও খিদে পেয়েছে।"

দামিনী প্লেট সাজায়। ডোরা খাবার সার্ভ করে। চেয়ার টেনে তিনজন খেতে বসে। একেবারে বাঙালি ডিশ। ইন্দোনেশিয়ায় ভাতের চল আছে। ডেইজ়ি বলে, "এই দামিনী, তুই ক'দিনের ছুটি নিয়েছিস? ফিরেই কাজে জয়েন করবি?"

"না, না, বিশ্বভারতী যাব, পি এইচ ডি-র সার্টিফিকেট আনতে হবে," দামিনীর কথা শেষ না হতেই ডোরবেল বেজে ওঠে। ডোরা দরজা খোলে। হোটেলবয় জানতে চায় এক্সট্রা কিছু লাগবে কিনা।

ডোরা 'নো থ্যাঙ্কস,' বলে দরজা বন্ধ করে। আবার খোলে। ওয়েটারকে ডাকে, "হ্যালো, হ্যালো, ভিতরে একবার আয়।"

ওয়েটার ডোরাকে আগে থেকেই চেনে। সে ঘরে ঢুকে দাঁড়াতে ডোরা বলে, "ডেইজ়ি, এর নাম কর্ণবেনু। ওর বাড়ি ওই আবিন দ্বীপে। এবার কী জানতে চাস বল।"

অবশেষে দ্বীপ সম্পর্কে কর্ণবেনুর কথায় ডেইজ়িরা জানতে পারে, আবিন এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে। আদিবাসী জেলেদের বাস। প্রায় পঁচিশ বছর হল লুড়কিবাবা ওখানে আছে। সে এমন মগজ ধোলাই করেছে যে, দ্বীপের সকলে সাদা জামাকাপড় পরে, ঘরবাড়ি এমনকী নৌকো, সব সাদা। এটা জলদেবতার নির্দেশ, না হলে আবিন একদিন সমুদ্রে ডুবে যাবে।

॥ ২ ॥

"এই ডেইজ়ি, ইন্দোনেশিয়ার নেচারটা একটু বলবি, তুই তো সারাদিন স্টাডি করছিস। দামিনীর কথায় ডেইজ়ি জানলা থেকে চোখ না সরিয়ে বলে, "এমন অদ্ভুত দ্বীপ রাষ্ট্র বিশ্বে আর নেই। প্রায় ষোলো হাজার দ্বীপ থাকলেও বেশির ভাগটাই জলের তলায়। মাঝে-মাঝে ডলফিনের মতো জেগে ওঠে আবার তলিয়ে যায়।"

ডোরা বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে, "আর এখানকার আগ্নেয়গিরির কথা বল। ত্রিশ-বত্রিশটা ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি কয়েক দশক ধরে ঘুমিয়ে আছে। শুধু মাঝে-মাঝে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।"

দামিনী অবাক হয়ে ওদের কথা শোনে। গাড়ি ছুটে চলেছে সমুদ্রের বুকে আঁকাবাকা ব্রিজ দিয়ে, আবিন দ্বীপের উদ্দেশে। ডোরা লোকাল গাইডের কাছে পর্যটকদের হ্যান্ডওভার করে বন্ধুদের সঙ্গে আজ নিশ্চিন্ত। তিন বন্ধু একটু পরেই পৌঁছে যাবে রহস্যময় হোয়াইট আবিন দ্বীপে।

"এই ডেইজ়ি, গতকাল বিকেলটা কেমন ঘুরলি বল? মন্দিরময় বালি দ্বীপ, চিনা জাপানি ওলন্দাজ আর্কিটেক্ট, উফ, ফাটাফাটি!" কথা শেষ না হতেই দামিনী বলে, "তবে যাই বল ডোরা, বাটুবুলানে কৃষ্ণ নাচ আর রাতের অন্ধকারে চিন্তামণি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি মার্ভেলাস লেগেছে। কিন্তু এই ডেইজ়ি, উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাইলের পর-মাইল ব্রিজ কে বানাল রে, আমাদের দেশে তো এক মাইল বানাতে দশ বছর লাগিয়ে দেয়।"

ডোরা পাশ থেকে হেসে বলে, "আরে এটা ইন্ডিয়া না, এসব বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় হয়েছে।"

ওদিকে ডেইজ়ি কর্ণবেনুর সঙ্গে গল্পে মশগুল। কাহাসা ভাষা, জাতীয় ফুল কর্ণচাপা, হিন্দু মন্দির রামায়ণী-নাচ, পাপ-পুণ্য আগ্নেয়গিরি— নানা বিষয় নিয়ে গল্প করে। কিন্তু কথার মাঝে ডেইজ়ি আচমকা লুড়কিবাবার কথা বলতেই কর্ণবেনু চুপ করে যায়। পরে বলে, "বাবার কথা বলা মহা পাপ। না শুনলে সুন্দর আবিন দ্বীপ তলিয়ে যাবে।"

ডেইজ়ি মনে-মনে ভাবে, একবিংশ শতাব্দীতে এসব অলৌকিক কাহিনি বিশ্বাস করতে হবে?

প্রায় চল্লিশ মিনিট সমুদ্রের বুকে আঁকাবাঁকা পথে যাওয়ার পর অবশেষে ডেইজ়িরা আবিন দ্বীপে পৌঁছয়। সবুজ অরণ্যে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ। যেন কচ্ছপ উলটে আছে।

"এই ডোরা দ্যাখ দ্যাখ, পুরো দ্বীপটা কেমন লাল সীমানা দেওয়া!" দামিনীর কথায় ডোরা বলে ওঠে, "আরে মর্কট, ভাল করে দ্যাখ, ওগুলো লাল কাঁকড়া। পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে।"

"তাই নাকি! এক্সেলেন্ট! দাঁড়া, আমি দেখে আসি," বলে ঝুপ করে গাড়ি থেকে নেমে পাড়ে চলে যায়।

ডেইজ়িও গাড়ি থেকে নামে, পিছনে ডোরা। ঘন জঙ্গলে আবৃত দ্বীপে নাটমেগ, নারকেল, কাঠচাঁপা, বুনো ঝাউ—আরও কত গাছপালা। সেই সঙ্গে নানা রংয়ের

কথা শেষ হওয়ার আগেই ডেইজ়িরা দেখে আশপাশের গাছপালা থেকে বিশ-ত্রিশটা বানর মন্দিরের রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে বসে। সবার হাত মাথার উপর।

ফুলগাছ। পাখিদের কলকাকলি কানে আসছে। দামিনী ছুটে আসে। সামনে ছোট্ট মন্দির দেখে বলে ওঠে, "ওয়াও! ওয়ান্ডারফুল! থ্যাঙ্ক ইউ ডোরা।"

দামিনী এগিয়ে যেতেই কর্ণবেনু বারণ করে, "ম্যাডাম, সামনে দাঁড়ান। মাঙ্কিরা ওয়েলকাম করবে।" কথা শেষ হওয়ার আগেই ডেইজ়িরা দেখে আশপাশের গাছপালা থেকে বিশ-ত্রিশটা বানর মন্দিরের রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে বসে। সবার হাত মাথার উপর। অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখে ডেইজ়িরা অভিভূত। ডোরা বলে, "এরা সব ওয়েল ট্রেন্ড।" দামিনী ফোটো তোলে। কর্ণবেনু বলে, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন," বলে এগিয়ে যায়।

মন্দির থেকে তিনজন আদিবাসী জেলে বেরিয়ে আসে। পরনে লুঙ্গি। কর্ণবেনুর কথা ডেইজ়িরা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সকলের পোশাক ঝলমলে রঙিন। অথচ সন্ধে হলেই সাদা হয়ে যাবে। সবই কি অলৌকিক? ছোট্ট মন্দিরে লাল সবুজ হলুদ রংয়ের প্রলেপ, তার উপর পশুপাখি আঁকা। এসবই কি সাদা হয়ে যাবে? ডেইজ়ি দেওয়াল ছুঁয়ে দেখে। না, কোনও রং হাতে লাগছে না। মানে স্থায়ী রং।

সকলে মন্দিরে ঢোকে। অবাক কাণ্ড! কোনও দেবদেবী নেই। দুটো বিশাল আকৃতির মাটির হাঁড়ি। ঢাকনা বন্ধ।

"এই যে কর্ণ, ওই হাঁড়ি দুটো কি শিব পার্বতী নাকি রাধাকৃষ্ণ?" ডোরার কথায় দামিনী বলে, "রামসীতাও হতে পারে।"

"এই তোরা থামবি, একটা কিছু টপিক পেলেই হল," ডেইজ়ি ধমক দেয়।

এর মধ্যে মন্দিরের পিছন থেকে মণিপুরি আদলে সারং পরে কানে কাঠচাঁপা ফুল গুঁজে হাত জোড় করে দুই ভদ্রমহিলা এসে নমস্কার করে। ডেইজ়িদের ঝাউডাল দিয়ে বাতাস করে সকলকে মালা পরিয়ে বরণ করে ভিতরে নিয়ে যায়।

কর্ণবেনু ওদের ভাষায় কী যেন আলোচনা করে। তারপর ডোরাকে বলে, "আপনারা পোশাক বদল করে নিন। না হলে দ্বীপে ঢোকা যাবে না।"

ডেইজ়ি প্রসঙ্গ পালটে জানতে চায়, "ওই পাত্রে কী আছে?" উত্তরে কর্ণবেনু বলে, "রঙিন পোশাকের লোকজন দ্বীপে ঢুকলে তাদের পোশাক শুদ্ধ করা হয়। তারপর গায়ে ওঠে।"

ডেইজ়ি বুঝতে পারে, তা হলে এটা মন্দির নয়, পোশাক পবিত্র করার জায়গা।

কর্ণবেনু সকলকে নিয়ে দ্বীপের রাস্তা ধরে। ছোট্ট সবুজ আবিন। ঝুড়ি ঝাউয়ের মাঝে-মাঝে মুরলি পাতার লালবর্ণ গাছ অপূর্ব দেখাচ্ছে। ঝাউয়ের মাথায়-মাথায় ফুল এসেছে। মাটিতে ছোট-ছোট লতা গুল্ম। বাহারি ফুল আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ত্রিভুজাকৃতি জেলেদের ঘর বাড়ি। বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক পাখি পাতা-ঝোপের আড়ালে ডাকছে।

ডেইজ়িরা গ্রামে ঢোকে। আদিবাসী জেলে পরিবার চোখে পড়ে, কিন্তু ছেলেদের দেখা নেই। এই বেনু গ্রামে পুরুষ থাকে না? আর মেয়েরা পাথরে ঘষাঘষি করে কী করছে? ডেইজ়ির কথায় কর্ণবেনু বলে, "ছেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছে। আর বউরা রঙিন লাভাপাথর কেটে গয়না বানাচ্ছে।"

"বাহ! অপূর্ব হাতের কাজ," বলে ডেইজ়ি ওদের থেকে একটা গয়না তুলে

নেয়। ভাবে আগ্নেয়গিরির গভীরে কঠিন পাথর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে কী অপূর্ব রং ধারণ করেছে। ডেইজ়ি হাত বোলায়।

এর পর ডোরা দামিনী লাভার অলঙ্কার নিয়ে কানে, হাতে, গলায় পরে।

হঠাৎ ডোরা চেঁচিয়ে ওঠে, "ডেইজ়ি, ডেইজ়ি, ওই দ্যাখ গাছের ডালে ম্যাকাও বসেছে। কী অপূর্ব রং। ওয়াও!"

দামিনী সঙ্গে-সঙ্গে ফোটো তোলে। কর্ণবেনু বলে, "ম্যাডাম, এখানে কাকাতুয়া লোরিস আনামারিয়া প্যারট এমনকী খোকা ডায়নোসর কোমোডোদের দেখতে পাবেন।"

"কিন্তু তোদের লুড়কিবাবার কাছে কখন নিয়ে যাবি?"

কর্ণবেনু বলে, "সন্ধের মধ্যে, না হলে ধ্যানে বসে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে।"

সকলে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে।

॥ ৩ ॥

সোনালি দিগন্তে সূর্য সবে অদৃশ্য হয়েছে। পশ্চিম আকাশে কেউ যেন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। লম্বা গাছের ছায়া মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সমুদ্র সৈকতে জেলেদের ডিঙিগুলো একে-একে ঢুকছে। মাথায় নুলিয়াদের মতো সাদা টুপি।

কর্ণবেনু সবাইকে নিয়ে একটা ত্রিভুজাকৃতি বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। কাঠের তৈরি বাড়িটি, আর মাথায় ডোঙাপাতার ছাউনি।

কর্ণবেনু মুখে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে। এগিয়ে গিয়ে ঘরে উঁকি দেয়। এর পর ইশারায় ডোরাদের ডেকে নেয়।

দামিনী বেশ ভয়ে-ভয়ে ভিতরে ঢোকে। সামনে হোগলাপাতার চাটাই। ডোরা ক্যামেরা বের করতে গেলে কর্ণবেনু ইশারায় বারণ করে।

ডেইজ়ি ভিতরে ঢুকে বাবাকে দেখে অবাক হয়। তামাটে লম্বা চুল, রং ফরসা, টানা-টানা চোখ, টিকালো নাক, নিয়মিত শেভ করা সুন্দর দেখতে এক চনমনে বুড়ো, পেন-খাতা নিয়ে কী যেন লিখছে। সাদা ধুতি, গলায় রঙিন লাভার মালা, প্রথমটা দেখে ডেইজ়ির একবারও সাধু-সন্ন্যাসী বলে মনে হয়নি। বরং আর একটু পরিপাটি থাকলে ডাক্তার, প্রফেসর মনে হবে। বাবাকে দেখে ডেইজ়ির মনে শ্রদ্ধা জাগে।

লেখালিখি বন্ধ করে বাবা সবার দিকে একবার তাকায়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "স্বপ্ন দেখো, স্বপ্ন দেখো। রং মিলান্তি বাদ দাও। জগৎ সাদা, মন সাদা, মিথ্যে রংয়ে লাভ কী?"

বলতে-বলতে বাবা পাশের ঝুলি থেকে একটা ছোট্ট সাদা টুকরো হাড়িতে ছুড়ে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে নীল ধোঁয়া বেরতে থাকে। এক সুন্দর মিষ্টি সুবাস ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। বাবা চোখ বন্ধ করেন।

ডেইজ়ি ভেবেছিল বাবার সঙ্গে দ্বীপের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে আলোচনা করবে। তর্ক করবে। বাবার কাছ থেকে সাদা রঙিনের গল্পটা শুনবে। কিন্তু কিছুই হল না।

ধীরে-ধীরে অন্ধকার নামে। দু'জন জেলে মাছের জাল বাঁশে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছে। শিশু কোলে এক মহিলা বাঁদিকের রাস্তা ধরে গ্রামে ঢুকছে। ডোরা বলে, "এই ডেইজ়ি, দেখ দেখ। ওদের জামাকাপড় কেমন সাদা-সাদা।" পাড়ের নৌকোগুলো ততক্ষণে সাদা হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মাঝখানে ত্রিভুজাকৃতি সাদা বাড়িগুলো অন্ধকারে অদ্ভুত লাগছে।

"ম্যাডাম, আজ ফিরবেন তো?" কর্ণবেনুর কথায় দামিনী বলে ওঠে, "ফিরব না মানে! এক্ষুনি ফিরব। এই ডোরা দেখছিস, অন্ধকারে সব সাদা হয়ে গিয়েছে। আমার তো ভয়-ভয় করছে।"

ডোরা আশ্বস্ত করে বলে, "তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। ডেইজ়ি কী প্ল্যান করছে আগে দেখি। এই ডেইজ়ি, প্ল্যানটা তো বলবি!"

ডেইজ়ি ওদের কোনও উত্তর না দিয়ে বলে, "এই কর্ণ, তোদের বাড়ি দেখাবি না? এতদিন পরে এলি, বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা তো করবি। আমরাও না হয় আজ রাতটুকু তোদের বাড়ি থাকব।"

"আপনারা থাকবেন? বাহ! তা হলে বাঁদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা পথ এগোলেই আমার বাড়ি। মা-বাবা আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

দামিনী দু'পা এগিয়ে ডেইজ়ির কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, "তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে? এই রাতে এই ভূতুড়ে দ্বীপে থাকবি? পাগল হয়েছিস?"

ডোরাও বলে ওঠে, "সিদ্ধান্তটা নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এখনও সময় আছে, জাকার্তায় ফিরে চল।"

ডেইজ়ি কোনও উত্তর না দিয়ে আপন মনে ছোট্ট আবিনকে দেখে। ছানাকাটা অন্ধকারে আকাশছোঁয়া গাছের ফাঁক দিয়ে ভগ্নাংশ চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ছায়াময় দ্বীপ, তার মাঝে সাদা ছোট-ছোট বাড়িগুলো যেন ক্যারামে ছড়ানো ঘুটি।

বেশ কিছুটা বনভূমি পেরিয়ে অবশেষে সকলে কর্ণবেনুর বাড়ি পৌঁছল। ছোট্ট বাড়িতে বাবা-মা আর এক বোন। পাশে আবছা অন্ধকারে একটা মানুষ গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন করছে। কর্ণবেনু দেখিয়ে বলে, "আমার বাবা, অরণ্যপুজো করছে। রোজ সকাল-সন্ধে করেন।"

"কেন?" ডোরা জানতে চাইলে কর্ণ বলে, "শুধু বাবা নয়, দ্বীপের সব বয়স্ক মানুষ সকাল-সন্ধেয় এই মন্ত্র পাঠ করে। দ্বীপটা যাতে সমুদ্রে তলিয়ে না যায়।"

মা বেরিয়ে এসে কর্ণবেনুকে বুকে জড়িয়ে ধরে, মাথায় হাত রাখে। কর্ণবেনু দু'হাত সামনে এনে নমস্কার করে। ডেইজ়িদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ওরা সকলে ঘরে ঢোকে।

"এই ডোরা, আমরা থাকব কোথায়? দুটো মাত্র ঘর।"

দামিনীর কথায় ডোরা মুখে আঙুল দিয়ে বলে, "চুপ কর। কর্ণবেনু কী ব্যবস্থা করে, দেখি।"

ডেইজ়ি উঠে দাঁড়ায়। লম্বা একটা হাই তুলে বলে, "এত সুন্দর একটা দ্বীপ, রাতে না দেখলে হবে? অন্ধকারে এক রূপ আবার ভোরে আলো ফুটলে বহুরূপীয় মতো অন্য রূপ, সেটা না দেখলে হবে? আমরা তো আবিন দ্বীপের রহস্য দেখতে এসেছি।"

॥ ৪ ॥

দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার আবিন ছোট্ট একটি দ্বীপ। সত্তর-আশি ঘর আদিবাসী জেলের বাস। কর্ণবেনুকে বাড়িতে রেখে ডেইজ়িরা ঘুরতে বেরয়। ছোট-ছোট রাস্তা এঁকেবেঁকে গ্রামে কখনও সমুদ্রের পাড়ে মিশেছে। সন্ধের পর কাউকে দেখা যায় না। যা কাজ, দিনের আলোয়। সূর্যের সঙ্গে এদের জীবনযাত্রা পুরোটাই জড়িত। ডেইজ়ি লক্ষ করে গাছের পাতা, ফুল, জংলি ঘাস, খুটিতে বাঁধা গোরু-ভেড়া, কোনও কিছুর রং বদলায়নি।

"এই দামিনী, জানিস তো, আগামিকাল সাইলেন্ট ডে, গোটা দ্বীপটা চুপ থাকবে। বুদ্ধের সাধনায় মগ্ন থাকবে। ভাবা যায়, শব্দদূষণ থেকে মুক্তির কী অপূর্ব পদক্ষেপ!" ডেইজ়ির কথায় দামিনী অবাক

হয়ে যায়। মুখে শুধু বলে, "বাহ, দারুণ!"

গভীর রাত, নিস্তব্ধ আবিন দ্বীপে সকলেই ঘুমিয়ে আছে। শুধু তিন কন্যা আলোআঁধারি রাস্তায় হাঁটছে। দামিনী ব্যাগ থেকে বাদামের প্যাকেট খুলে ডেইজ়ি ডোরাকে দেয়। ডোরা বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু কাজুটা দিলে ভাল হত।"

"কী হ্যাংলা রে বাবা, এখনও সারা রাত পড়ে আছে," দামিনীর কথা শেষ হয় না, ডেইজ়ি বলে, "এই ডোরা, বাবার ফোটোটা তোর ওই সি আই ডি আঙ্কলকে মেল করেছিস?"

"সে তো সন্ধেবেলায় করে দিয়েছি। আঙ্কল ভবানী ভবনে ঢুকলেই সার্চ করবে।"

ওরা হাঁটতে থাকে। ডেইজ়ি লক্ষ করে ওরা লম্বা পায়ে এগোচ্ছে। কেউ যেন পিছন থেকে ঠেলছে। অবাক হয়। খেয়াল করে রাস্তা ক্রমশ নীচে চলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ওঠে, "এই ডোরা! স্টপ স্টপ। আমরা বোধ হয় নীচে নামছি!"

দামিনী বলে, "সত্যি তো! আমি তো দৌড়চ্ছি!"

"দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায় এলাম বল তো? দ্বীপ তো অনেক পিছনে। চারদিকে গাছপালা, ঘর-বাড়ি কিছুই দেখা যাচ্ছে না," ডোরার কথায় ডেইজ়ি বলে, "আমার মনে হয় রাস্তাটা সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে। আর এগোনো ঠিক হবে না।"

কথা শুনে দামিনী পিছনে ছুট লাগায়। বলে, "আমি বাবা সামনে যাচ্ছি না।"

ডেইজ়ি দূরে তাকায়। জ্যোৎস্না আলোয় রাস্তা দেখা যাচ্ছে না, বাঁক নিয়েছে। আর রুপোলি রংয়ের বিশালাকার একটা থাম উপরে উঠে গিয়েছে। ডেইজ়ির অদ্ভুত মনে হয়। সে ডোরাকে নিয়ে ধীরে-ধীরে কাছে যায়। দেখে গম্বুজাকৃতি বস্তুটি কংক্রিটের। সামনে ছোট দরজা। ডেইজ়ি ঠেলা মারতেই খুলে যায়। ভিতরটা অন্ধকার। উঁকি দেয়, সমুদ্রের গর্জন কানে আসে।

"এই ডেইজ়ি, আমাদের থাকাটা এখানে নিরাপদ হবে না। জায়গাটা বিপজ্জনক," ডোরা ভয়ার্ত গলায় বলে।

"জানিস তো, আমার আইডিয়ায় বলে, এটা অনেকটা সাবমেরিনের মতো। যাক গে, দামিনী একা আছে। চল, আমরা ফিরে যাই।"

তিনজনে আবার একসঙ্গে পিছনে হাঁটতে থাকে। জ্যোৎস্না স্পষ্ট হয়। রাস্তাটা দ্বীপের উপরে উঠছে। লম্বা গাছের সারি-সারি ছায়া, মাঝে ঘর-বাড়ি। ঘুমিয়ে আছে আবিন দ্বীপ। ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সামনে গাছের বেদি। তিনজনে বসে। শরীরটা কিছুটা ক্লান্ত। মোবাইলে গান শুরু হয়। চারিদিকে সমুদ্র, ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। চোখ বুজে আসে, কিন্তু ডেইজ়ি শুধু সজাগ। মনটা রহস্যের গভীরে খননকার্য চালাচ্ছে।

অবশেষে আকাশ পরিষ্কার হয়। তারা দেখা যাচ্ছে না। পুবদিকের গাছপালা ধূসর থেকে সবুজ হচ্ছে। আকাশে ছানাকাটা মেঘ ক্রমশ সোনালি রং নিচ্ছে। দু'-একটা পাখি ডেকে ওঠে। হঠাৎ দামিনী চিৎকার করে, "ওই দ্যাখ, সাদা নৌকোগুলো যেন রঙিন হচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড।"

বাড়ির রংও বদলে যাচ্ছে। সবুজ-নীল-হলদে। "বাহ, বাহ," ডোরা চেঁচিয়ে ওঠে।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা এগিয়ে যায়। দ্বীপের পশ্চিমদিকে ঘন জঙ্গল। বাড়ি ঘর নেই। আকাশছোঁয়া গাছপালা যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। তিনজন গাছের নীচে এসে দাঁড়ায়। সামনে উত্তাল সমুদ্রের বুকফাটা গর্জন। ফেনিল জলরাশির বুকে হাঙরের মতো একটা ছোট্ট জাহাজ নোঙর করে আছে। ভিতরটা ভূতুড়ে অন্ধকার। উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

ডেইজ়ি আরও কাছে যায়। ডোরা বলে, "ওই দেখ, নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ধোঁয়া ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে। লাল, হলুদ, সবুজ, কখনও নীল।"

"এই ডেইজ়ি, তোর কথাটাই সত্যি হল। লুড়কিবাবার এটাই কেমিক্যাল জাহাজ। কিন্তু ভিতরে কী হচ্ছে, বুঝব কী করে?"

"মনে হচ্ছে ভিতরে কোনও কেমিক্যাল মিক্সিং চলছে। না হলে রঙিন ধোঁয়া ওঠে?" দামিনীর কথায় ডেইজ়ি কোনও উত্তর দেয় না। ধীরে-ধীরে সমুদ্রের কিনারায় যায়, নীচে নামে। ডোরা-দামিনী বারণ করে। অবশেষে ডোরাও ডেইজ়ির পিছন ধরে।

ডেইজ়ি একলাফে জাহাজে পাটাতন ধরে একধাপ উপরে উঠে ওই আলোকিত জানলায় মুখ রাখে। অবাক হয়ে দেখে বেশ কয়েকজন ছোট-বড় কাঁচের বিশাল-বিশাল জারে কী যেন মিক্সিং করছে। নীচে সরু নল দিয়ে সেই মিশ্রণ জল আর আগুনের পাইপ দিয়ে অন্য পাত্রে পড়ছে। আর ফুটন্ত পাত্রে রঙিন পাউডার দিতেই ধোঁয়া উদগিরণ হচ্ছে। সবাই মাস্ক পড়ে আছে।

ততক্ষণে ডোরা ডেইজ়ির পাশে এসে হাজির। ফিসফিস করে বলে, "ডেইজ়ি, এ তো দেখছি কেমিস্ট্রি ল্যাব। কী করছে ওরা?"

"এই ডোরা, চুপ! চুপ! ওই দ্যাখ দূর থেকে কে যেন এদিকে আসছে।"

ডোরা বলে ওঠে, "এই দামিনী! দ্যাখ-দ্যাখ, শুনতেই পাচ্ছে না! আরে ওই মর্কট! গাছের আড়ালে যা।"

দূরের ছায়ামূর্তি ক্রমশ কাছে আসে। জাহাজে সামনের দিকে ছোট নৌকোয় নেমে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢোকে। লম্বা গাছের ছায়া পড়ায় ডেইজ়িরা জাহাজের গায়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।

"ডেইজ়ি, ঠিক মতো ধরে থাকিস, পড়লে কিন্তু সমুদ্রে তলিয়ে যাবি," পার থেকে ডোরার কথায় ডেইজ়ি মুখে আঙুল দেয়।

ছায়ামূর্তি ঘরে ঢোকে। এ তো সেই বাবা! ডেইজ়ি একটুও অবাক হয় না। কিন্তু এই কি সেই কেমিক্যাল বাবা!

"ডেইজ়ি, তোর কথাই সত্যি হল। আবিন দ্বীপে কোনও অলৌকিক কাণ্ড হচ্ছে না। পুরোটাই সায়েন্স," ডোরার কথায় ডেইজ়ি আবার মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে।

হঠাৎ দামিনী পার থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, "এই ডোরা, নেমে আয়, কারা যেন এদিকে আসছে।" ডেইজ়ি একবার তাকিয়ে আবার ভিতরে দেখে। বাবা পকেট থেকে বোতামের মতো কী যেন বের করে বড় পাত্রের ফুটন্ত মিশ্রণে ফেলছে। ব্যস! অমনি অজস্র বুদবুদ তৈরি করে রঙিন ধোঁয়া চোঙ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

ডোরা বলে, "এই ডেইজ়ি, জাকার্তার পুলিশ অফিসার মিঃ তোগাবালু দলবল নিয়ে আসছে। তুই কি রাতেই ইনফর্ম করেছিলি? ব্যাটা বাবা পালিয়ে যাবে না তো?"

ডেইজ়ি ফিসফিস করে বলে, "পালিয়ে আর যাবে কোথায়? চারিদিকে জল, নির্ঘাত মৃত্যু। যাক গে, তুই ভিডিয়ো করছিস তো?"

অবশেষে তোগাবালু জাহাজের কাছে

আসতেই ডেইজ়ি ইশারা করে। সবুজ পোশাকের পুলিশ জাহাজটাকে ঘিরে ফেলে। ডেইজ়িরা ঝুপ করে জাহাজে নামে। পুলিশকে নিয়ে সোজা কেমিক্যাল রুমে।

ডেইজ়ি অবাক বিস্ময়ে দেখে লুড়কিবাবা এতটুকু বিচলিত না হয়ে নিজের কাজ করতে-করতে বললেন, "আপনারা আসবেন, সে-কথা কর্ণবেনু আমাকে বলেছে। দেখুন, এই দ্বীপে কে কখন কী উদ্দেশ্যে ঢুকছে, সবই দ্বীপের লোকজন আমাকে বলে। আর ম্যাডাম, আপনি আমার সম্পর্কে জানতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মেল করেছেন।"

"হ্যান্ডস আপ, আপনার বুজরুকি শেষ। আস্ত একটা দ্বীপকে আপনি বোকা বানিয়ে রেখেছেন?" পুলিশ অফিসার তোগাবালুর কথায় কর্ণপাত না করে লুড়কিবাবা ডেইজ়িকে বলে, "ম্যাডাম, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"হ্যাঁ বলুন, কী বলবেন?" ডেইজ়ি বেশ শক্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

লুড়কিবাবা বিনয় সহকারে বলে, "সবার সামনে সেসব কথা বলা যাবে না। পাশের ঘরে যেতে হবে।"

"খবরদার! ডেইজ়ি, তুই কোথাও যাবি না!" দামিনীর চিৎকারে তোগাবালু বলে, "এই যে ভণ্ড সাধুবাবা, যা বলার এখানেই বল।"

ডেইজ়ি কিছুটা বিরক্ত হয়ে সবাইকে থামিয়ে বলে, "প্লিজ় সবাই একটু থামুন। চলুন, কোথায় যেতে হবে?"

"ওয়ান মিনিট, আগে বাবাকে সার্চ করে নিতে হবে। যদি কোনও অস্ত্র সঙ্গে থাকে," বলেই তোগাবালু বাবাকে সার্চ করে। এর পর ডেইজ়িকে নিয়ে বাবা পাশের ঘরে ঢোকে। সুইচ অন করে দরজা বন্ধ করে। ঘর দেখে ডেইজ়ি বিস্ময়ে অবাক। ছোট ঘরটিতে কী নেই! কেমিস্ট্রি ল্যাব, পাশে র‍্যাকে সারি-সারি কেমিস্ট্রির রিসার্চ ওরিয়েন্টেড বই, সাউন্ড সিস্টেম, ওয়েবক্যাম, প্রজেক্টর মেশিন। ঘরের ঠিক উপরে চিমনি বসানো। এ তো দেখছি হারভার্ড ইউনিভার্সিটির কেমিক্যাল ল্যাব!

বাবা চেয়ারে বসে ল্যাপটপ অন করে। পাশের সিটে ডেইজ়িকে বসায়।

এদিকে বাইরে তখন দামিনী, ডোরা, তোগাবালুরা উৎকণ্ঠায় অস্থির। ডোরার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দামিনী ভাবে, বাবা যদি ডেইজ়ির উপর হামলা চালায়। তোগাবালুর কপালে ঘাম। লোকটি মেয়েটির যদি ক্ষতি করে। যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে সবাইকে মেরে ফেলে! তা হলে কি এখনই অ্যাটাক করা দরকার?

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। সকলে বিস্ময়ে হতবাক! দেখে ডেইজ়ি উৎফুল্ল হয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ডোরা, দামিনী যেন ভূত দেখছে। তোগাবালু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ডেইজ়ি বাবাকে প্রণাম করে বলে, "আশীর্বাদ করুন, মানব সেবায় আপনার যে মহান ব্রত, তার কিছুটা যেন আমরা পাই।"

"এই ডোরা, ডেইজ়ি কি পাগল হয়ে গেল? নাকি বাবা অলৌকিক জাদুতে বশ করেছে?" দামিনী ফিসফিস করে কিছু বলে, ডোরা উত্তর দেওয়ার আগেই ডেইজ়ি বলে, "আবিন দ্বীপের রহস্যে অলৌকিক কাণ্ড বলে কিছু নেই। পুরোটাই কেমিক্যাল সায়েন্স।

আমাদের ব্যবহার্য প্রায় সমস্ত কৃত্রিম রঙিন বস্তুকণা লেড যুক্ত, যা দূষিত এবং ক্ষতিকারক। এর হাত থেকে মুক্তি ঘটাতে বাবা এমন কেমিক্যাল আবিষ্কার করেছেন যাতে সূর্যরশ্মিতে বস্তুকণা নানা রং ধারণ করে। আর সূর্য ডুবে গেলে পুনরায় সাদা হয়ে যায়।"

"এই ঘটনায় বাবার উদ্দেশ্য কী?" ডোরার প্রশ্নে ডেইজ়ি বলে, "সমগ্র বিশ্বে কেমিক্যাল রং ব্যবহার বন্ধ হোক। সূর্যের আলো বিকল্প রংয়ের পথ দেখাক।"

"সব বুঝলাম, দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য লোকটি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু একটা দ্বীপে মানুষকে বোকা বানানো, তলিয়ে যাওয়ার ভয় দেখানো, সেটার ব্যাখ্যা লুড়কিবাবা দিয়েছেন?" তোগাবালুর কথায় ডেইজ়ি বলে, "আসলে বিশ্বে সমস্ত আবিষ্কারের ফল প্রথমে মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই আবিষ্কারক অলৌকিক কাণ্ডের কথা বলে মানুষকে বশ করে। বাবা সেই পথ বেছে নিয়েছেন।"

"উনি তো তা হলে বিখ্যাত মানুষ," দামিনীর কথায় ডেইজ়ি বলে, "এই লুড়কিবাবা আসলে বিখ্যাত কেমিক্যাল সায়েন্টিস্ট মিঃ কৃপাসিন্ধু পাঠক।"

"তার মানে উনি বাঙালি! বা! বা! কিন্তু বাবা এতদূরে কেন এসেছেন?" ডোরার কথায় লুড়কিবাবার মুখে হাসি ফোটে। চোখের কোণা চিকচিক করে ওঠে। জোড়হাত করে বলেন, "বিশ্ববাজারে সমস্ত রং কোম্পানিগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে কেউ আমার গবেষণাকে গুরুত্ব দেয়নি। অথচ পৃথিবী যে একটু হলেও দূষণমুক্ত হবে, একথা কেউ ভাবল না। তাই ঘুরতে-ঘুরতে একদিন ইন্দোনেশিয়ায় হাজির হলাম। মাথায় এল একটি দ্বীপকে নিয়ে কাজ শুরুর পরিকল্পনা। সেই উদ্দেশ্যে প্রায় পঁচিশ বছর এই আবিন দ্বীপের জেলেদের সঙ্গে আছি। ওরা জানে এটা আমার অলৌকিক ক্ষমতা। জীবনে একটাই স্বপ্ন, পৃথিবী একদিন সাদা হয়ে যাবে। আর সূর্যের আলো রাঙিয়ে দেবে আমাদের। কিন্তু প্লিজ় আবিনের জেলেদের এই কাহিনি বলবেন না," বলতে-বলতে লুড়কিবাবা উদাস হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। দেখে পুবের সূর্য তখন সবে উঠছে। সোনালি আলো সমুদ্র ঢেউতে বিলি কেটে রংয়ের বিস্ফুরণ ঘটাচ্ছে।

ছবি: কুণাল বর্মন

আমার স্কুলের খুদে প্রতিভা

আনন্দমেলা আয়োজিত এই স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এবারের বিষয় ছিল 'গ্রীষ্মকাল'। অংশ নিয়েছিল এই দু'টি স্কুল, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান এবং ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা। এদের থেকে পাওয়া অসংখ্য এন্ট্রি থেকে বেছে নেওয়া প্রথম ৭টি ছবি ও লেখা যারা পাঠিয়েছে, তারা হল:

১. **সুচরিতা প্রামাণিক,** *অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা।*
২. **চন্দ্রিকা চক্রবর্তী,** *পঞ্চম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।*
৩. **স্বস্তিকা পাল,** *পঞ্চম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।*
৪. **ডোনা ঘোষ,** *সপ্তম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস, কলকাতা।*
৫. **মিষ্টি ঘোষ,** *অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা।*
৬. **সুপ্রিয়া ঘোষ,** *অষ্টম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।*
৭. **অর্ণবী সরকার,** *অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস, কলকাতা।*

প্রথম

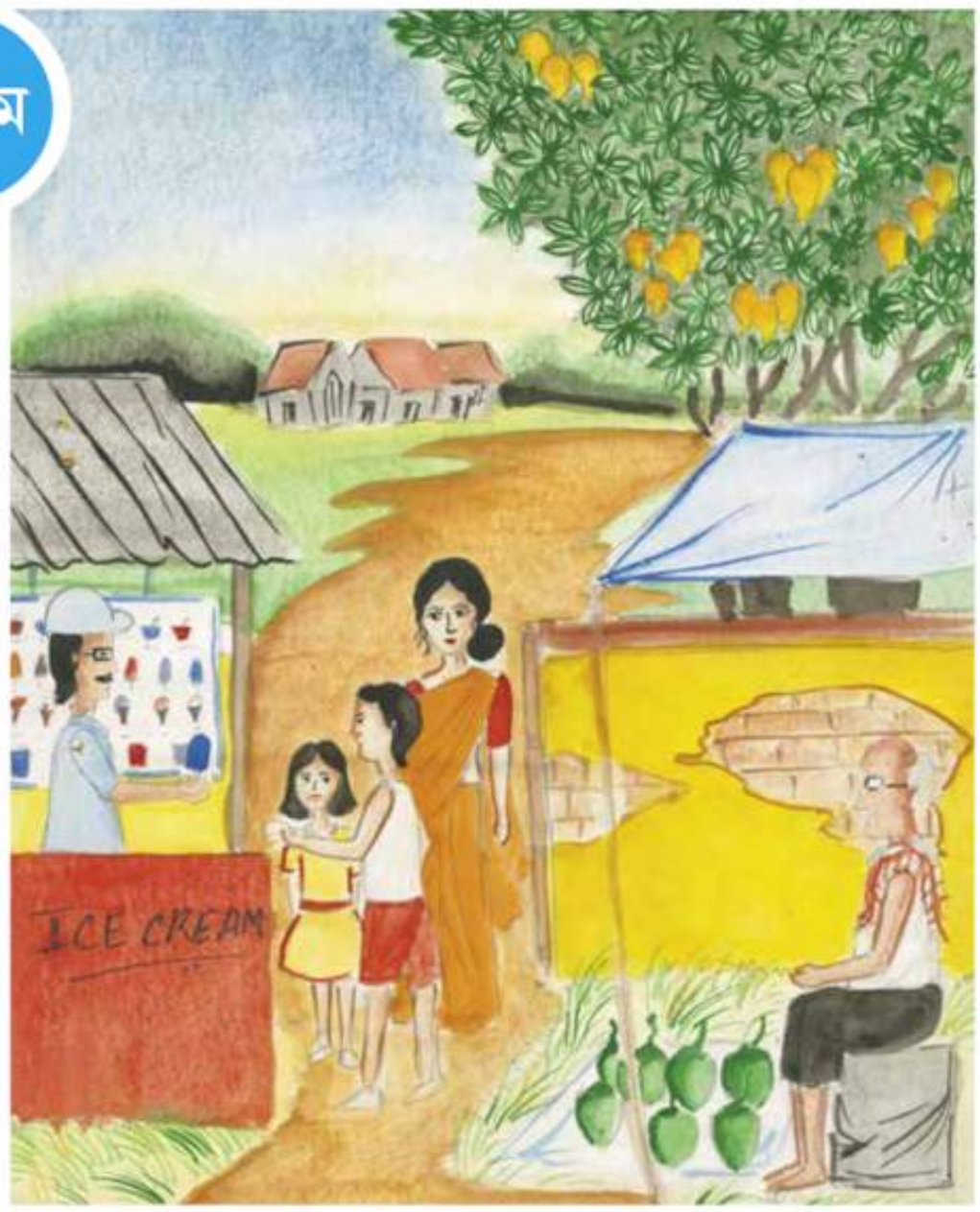

সুচরিতা প্রামাণিক
অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা।

দ্বিতীয়

গ্রীষ্মকাল

গ্রীষ্ম মানে দারুণ গরম,
মালদহ আর মুর্শিদাবাদে
দুখু মিঁয়া এই সময়ে
মে দিবসে শ্রমিকরা সব
সারা বছর ধারে চলে
এই সময়েই নেপাল দেশে
ব্যবসায়ী দাদারা সব
শাশুড়িদের জামাইষষ্ঠী,
খেটে খাওয়া মানুষদের
গ্রামে-গঞ্জে এই সময়ে
সুখ-দুঃখ দুটোই আছে
একই বৃন্তে দু'টি কুসুম

ফ্যান চালিয়েও নেই আরাম
গন্ধ ছড়ায় হরেক আম।
বিদ্রোহেরই আগুন জ্বালায়,
হে-মার্কেটে দাবি জানায়।
পয়লা বোশেখ নগদ জমা
পালিত হয় বুদ্ধ পূর্ণিমা।
তৈরি করেন হালখাতা,
আদর পান সব জামাতা।
হয় যে চরম দুর্ভোগ,
আসে সব বিচ্ছিরি রোগ।
গ্রীষ্মকালে মোদের ভাই,
রবি-নজরুলের শিক্ষা চাই!

চন্দ্রিকা চক্রবর্তী
পঞ্চম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।

তৃতীয়

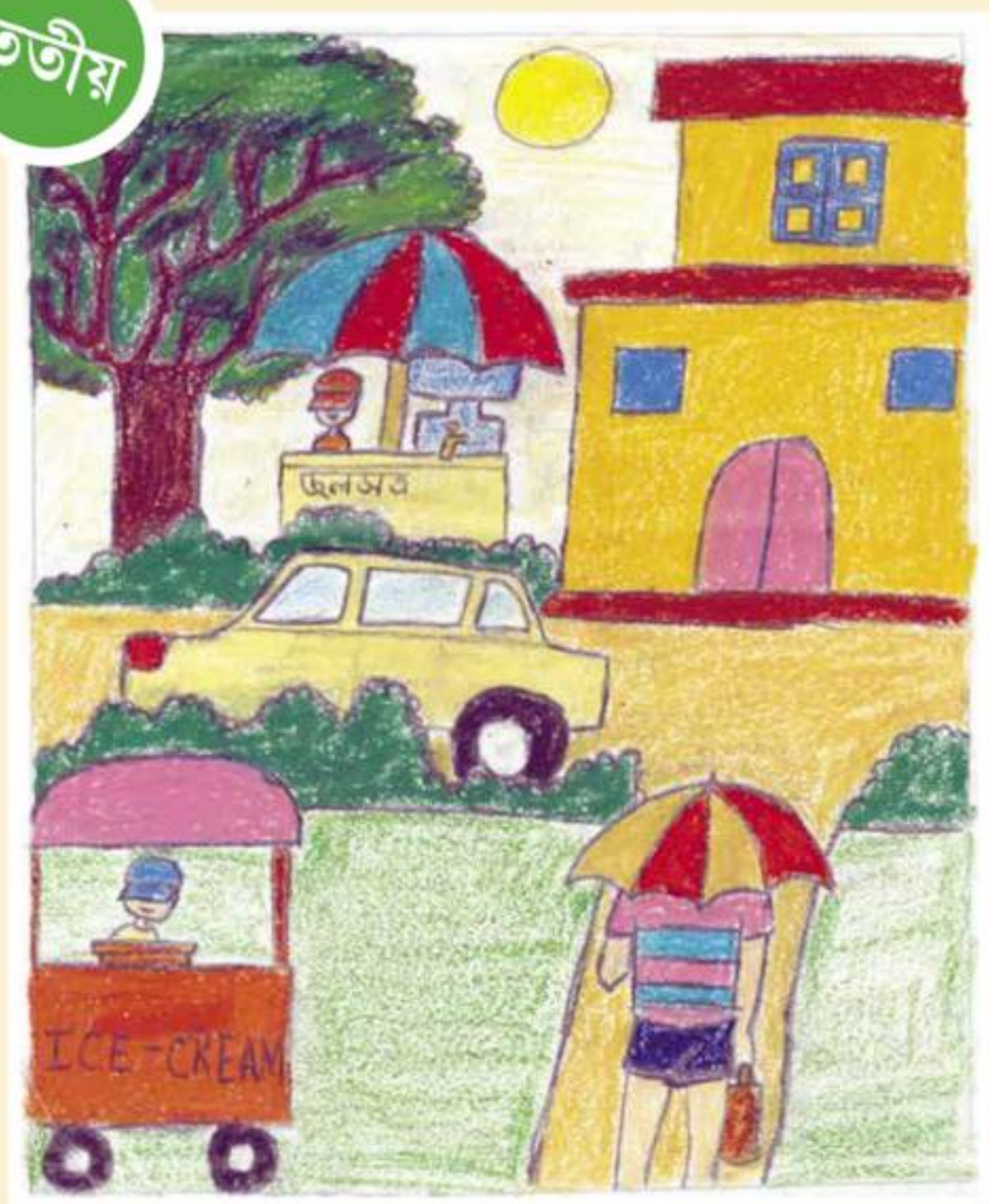

স্বস্তিকা পাল
পঞ্চম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।

চতুর্থ

গ্রীষ্মকাল

নীল আকাশে সূর্য ওঠে
বেলায় আগুন-ফুলকি ছোটে
মাঠ ভরে থাকে সবুজ ঘাস
চলে কৃষকদের চাষবাস।

গ্রীষ্মে হঠাৎ বৃষ্টি নামে টাপুরটুপুর
নদী-পুকুরে মাছ লাফায় ঝাপুরঝুপুর
গাছে-গাছে ধরে লিচু-আম
খেলে প্রাণে হয় আরাম।

বাতাস খুবই গরম থাকে
মৌমাছি ওড়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে,
প্রজাপতি ফুলে মধু খায়
শিশুরা মাঠে খেলতে যায়।

গ্রীষ্মকালে নদীর জলে খুব সাঁতার
গাছে-গাছে পাখির ডাকে সুরবাহার
দিনের বেলা সুয্যিমামার কঠোর শাসন
বিকেল হলেই কালবৈশাখীর প্রলয়নাচন।

ডোনা ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা।

পঞ্চম

মিষ্টি ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এইচ এস স্কুল (ফর গার্লস), কলকাতা।

ষষ্ঠ

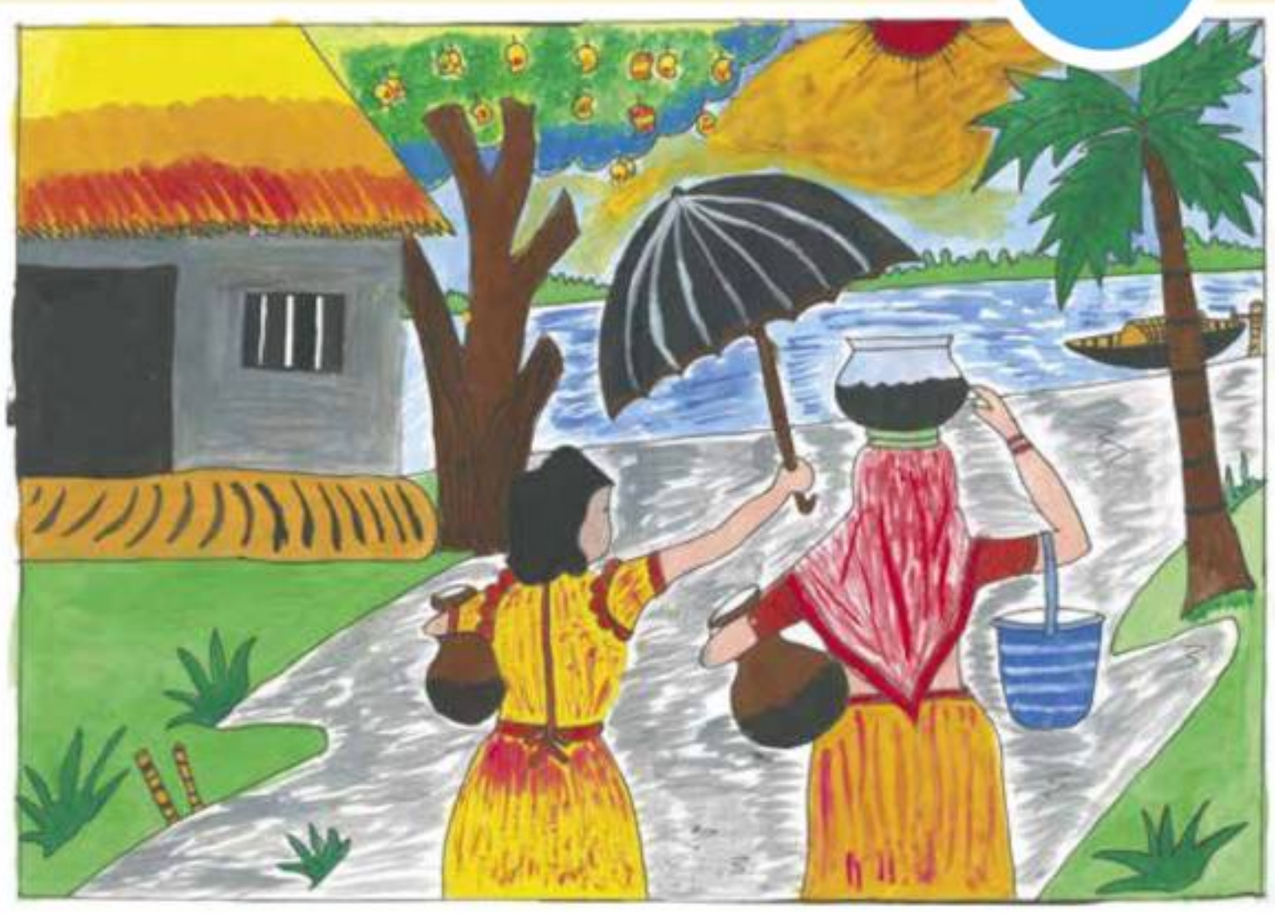

সুপ্রিয়া ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, ইছলাবাদ বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বর্ধমান।

সপ্তম

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দু'টি মাস গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের দিনগুলো প্রচণ্ড উষ্ণতায় উত্তপ্ত থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মেরও যে একটা সৌন্দর্য আছে, সেটা আমরা ইট-কাঠের জঙ্গলে থাকা শহরবাসীরা ঠিক ঠাহর করতে পারি না। বোলপুরের শান্তিনিকেতনের প্রবল উত্তপ্ত দুপুরগুলোকে পল্লিবাসীরা অপূর্ব সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলে। শান্তিনিকেতনে আছে লাল মাটির পথ ও নানা গাছে পরিপূর্ণ সবুজে ঘেরা বাগান। গ্রীষ্মের দুপুরে ক্লান্ত পল্লিবাসীরা যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন রাখাল ছেলে গোরু চরায় এবং ঝুপসি গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজায়। সেই বাঁশির সুর যেন নির্জন গরমের দুপুরকে আরও মোহময় করে তোলে। গাছের ডালে বসা শালিক-চড়ুইয়ের কলতান যেন দুপুরের এক নিজস্ব সংগীত। প্রবল গ্রীষ্মেও শান্তিনিকেতনের এই চিত্র অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

অর্ণবী সরকার
অষ্টম শ্রেণি, ক্রিস্টোফার রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস, কলকাতা।

জীবন্ত কোরালের অপূর্ব সৌন্দর্য

সাগরপারের মীনমহল

আমেরিকার বোস্টন শহরের এক আশ্চর্য সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়ামের কথা ঘুরে এসে লিখেছেন প্রসেনজিৎ সিংহ

জানি, তোমাদের অনেকেই অ্যাকোয়ারিস্ট। যেমন ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের ফিলাটেলিস্ট কিংবা মুদ্রা সংগ্রাহকদের নিউমিসম্যাটিস্ট বলে, তেমনই যারা বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পোষে, তাদের অ্যাকোয়ারিস্ট বলে। গাপ্পি, রেড মলি, পার্ল গোরামি কত রংবেরংয়ের মাছ পোষো তোমরা। কাচের বাক্সে জলজ উদ্ভিদ আর মাছের জন্য কেঁচোসহ অন্য খাবারদাবার দিয়ে জলের নীচে একেবারে জমজমাট মাছের পাড়া তৈরি করো তোমরা। বাবা-মায়েরাও চান, মাছ বা অন্য পোষ্যের দেখভাল করতে-করতে তোমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে উঠুক।

অভ্যেসটা পুরনো। প্রাচীন রোমে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য খাটের তলায় শ্বেতপাথরের জলাধারে বার্বেল মাছ রাখা হত। দেখার সুবিধের জন্য পরে পাত্রের একদিকের দেওয়ালে কাচ ব্যবহার শুরু হয়। সে আনুমানিক ৫০ খ্রিস্টাব্দের কথা। আবার চিনে মিং রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট হনগিউ পোর্সেলিনের চৌবাচ্চায় গোল্ডফিশ পুষতেন শোনা যায়। গোল্ডফিশের কদর শুরু সেই থেকেই। তোমরাও পেটমোটা কাচের পাত্রে অনেকেই গোল্ডফিশ পুষেছ, সে খবর বিলক্ষণ আছে।

তবে যদি সর্বসাধারণের দেখার জন্য অ্যাকোয়ারিয়ামের ইতিহাস বলো, সেটা শুরু করার কৃতিত্ব ফিলিপ হেনরি গোসের। ১৮৫৩ সালে লন্ডন চিড়িয়াখানায় তিনি প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম বসিয়েছিলেন। তখন বলা হত 'ফিশ হাউজ়'। পরে 'অ্যাকোয়ারিয়াম' শব্দটিও তিনিই চালু করেন।

আমেরিকার বোস্টন শহরে অতলান্তিক মহাসাগরের ধারে রয়েছে এমনই এক দ্রষ্টব্য নিউ ইংল্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়াম, যা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (সংক্ষেপে যা এম আই টি নামে পরিচিত) এই শহরে দেখার জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ দর্শক আসেন। তাদের বড় অংশই তোমাদের মতো কচিকাঁচারা।

টিকিট কাটার লম্বা লাইন। তবে ইন্টারনেটে টিকিট কাটলে লাইন দিয়ে সময় নষ্ট করতে হয় না। ঢোকার সময় দর্শকদের হাতে একটা মাছের ছাপ মেরে দেওয়া হয়।

ভিতরে ঢুকতেই দল বেঁধে অভ্যর্থনা জানাবে পেঙ্গুইন।

অ্যাকোয়ারিয়ামের উপরতলায় সমুদ্রপাঠের আসর

এই পেঙ্গুইনদের দেশের বাড়ি অবশ্য আন্টার্কটিকা নয়। অর্থাৎ আকারে সবচেয়ে বড় এম্পেরার পেঙ্গুইন নয় এরা। তবে উষ্ণ অঞ্চলেও বিভিন্ন প্রজাতির পেঙ্গুইন থাকে। গ্যালাপাগোস দ্বীপের কথা তোমরা জান। যেখান থেকে ঘুরে আসার পর ডারউইন লিখেছিলেন বিবর্তনবাদের বিখ্যাত বইটি। নিরক্ষীয় অঞ্চলের সেই দ্বীপেও ছোট-ছোট পেঙ্গুইন পাওয়া যায়। তবে নিউ ইংল্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামে খোলা জায়গায় যে পেঙ্গুইনগুলো রয়েছে, তারা মূলত আফ্রিকান পেঙ্গুইন। এদের 'জ্যাক্যাস পেঙ্গুইন'ও বলে। কারণ, এদের ডাক গাধার মতো। আর আছে 'সাদার্ন রকহপার্স' পেঙ্গুইন। এখানে দেখা যাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পেঙ্গুইন হিসেবে খ্যাত 'ব্লু পেঙ্গুইন'ও, কেবল অস্ট্রেলিয়া আর নিউজ়িল্যান্ডেই যাদের বাস।

অক্টোপাস

বাইরে একটা জলাশয়ে দেখা মিলবে সিল পরিবারের। তাদের কেউ জলে নেমে দাপাদাপি করছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। আবার সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে কেউ হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে পাথরে। হেঁটে-হেঁটে অ্যাকোয়ারিয়াম দেখে ক্লান্ত বাচ্চাদের অনেকে একফাঁকে বাইরে এসে সিলগুলোর খেলাধুলো দেখে নেয়। সিলগুলোর এনক্লোজ়ারের একপাশে বসার জায়গা রয়েছে কিনা!

মূল দ্রষ্টব্য বা সবচেয়ে বড় জলাধারটি দেখার আগে অনেকেই ঘুরে নেয় চারপাশের ছোট-ছোট অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো। কী আছে সেখানে? নানা ধরনের জলজ প্রাণী, কোথাও স্টারফিশ, সি আরচিন, কোথাও জীবন্ত কোরালের বর্ণময় ছটা। জলের মৃদু আন্দোলনে তাল মেলাতে-মেলাতে নিজেই যেন তারা প্রকৃতির গান হয়ে উঠছে। আবার কোথাও তপ্ত নিভু-নিভু লোহার রংয়ের মতো অক্টোপাস তার শুঁড় ছড়িয়ে দিচ্ছে পেলব সুরের মতো। এদের কিন্তু তিনটে হৃদপিণ্ড আর আর ন'টা মস্তিষ্ক! মোটেই হেলাফেলার নয়। তার উপর এরা আবার প্রকৃত অর্থেই 'নীলরক্তের অধিকারী', অভিজাত।

অক্টোপাসের রক্ত নীল, কারণ এদের রক্তে থাকে হিমোসায়ানিন নামে তামাযুক্ত রঞ্জক পদার্থ। জানিয়ে রাখি, সব মিলিয়ে নিউ ইংল্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামে রয়েছে ছ'শো প্রজাতির ২২ হাজারেরও বেশি জলজ প্রাণী।

এবারে বলি, মূল অ্যাকোয়ারিয়ামের কথা। সেটা যেন একটা চারতলা উঁচু বিশাল কুয়োর মতো। কিংবা একটা কাচের গ্লাসকে হঠাৎ লক্ষগুণ বড় করে দিলে যেমনটি লাগবে, অনেকটা সেরকম। এই বিশাল কুয়োর ধারণ ক্ষমতা দু'লক্ষ গ্যালন। সেই জলাধারের গা বেয়ে উঠে গিয়েছে র‍্যাম্প। হুইলচেয়ার নিয়েও উঠে পড়া যায়। উঠতে-উঠতেই দেখা যাবে সেই বিশাল জলাধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টিং রে, যেন জলের ভিতরে চারকোণা ছাতা। বনেটহেড শার্ক, বারাকুডা, মোরে ইল, রং বেরংয়ের মাছ-সহ সহস্রাধিক জলজপ্রাণী। আর আছে 'মার্টল' নামে একটি গ্রিন সি টার্টল বা কচ্ছপ। দর্শনার্থী এক বৃদ্ধ তার নাতিকে সেই কাছিম দেখিয়ে বলছিলেন, তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর বাবা যখন তাঁকে এই অ্যাকোয়ারিয়ামে নিয়ে এসেছিলেন তখনও তিনি এটিকে দেখেছিলেন। কথাটা ভুল নয়। নব্বই বছরের এই বিশাল কাছিমটি জলাধারে রয়েছে ১৯৭০ সালে যখন অ্যাকোয়ারিয়ামের উদ্বোধন হয়, তখন থেকেই।

হঠাৎ জলজ প্রাণীদের সঙ্গে দেখা গেল, এক ডাইভারকে। দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে চলে গেলেন তাঁর কাজে। কাজ বলতে প্রতিদিন নজরদারি করতে হয় সেই জলজ প্রাণীদের সংসার। ফলে প্রতিদিনই তাঁদের জলে নামতে হয়। চারতলার উপরে যেখানে এই জলাধারের মুখ, সেখানে সামুদ্রিক জীববিশেষজ্ঞরা দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সহজ করে বুঝিয়ে দেন সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের হাজার খুঁটিনাটি। তবে অ্যাকোয়ারিয়ামের কর্মকাণ্ড চার দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এঁরা সারা বছর বিভিন্ন কর্মশালা, অনুষ্ঠান করেন। তিমি দেখাতে নিয়ে যান সমুদ্রে। আয়োজন করেন হারবার ডিসকভারি সামার ক্যাম্পের। এসবের উদ্দেশ্য একটাই, তোমাদের মতো এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দাদের আরও সচেতন করা। যারা পৃথিবীকে বোঝাবে, নীল গ্রহটা শুধু আমাদের নয়, ওদেরও।

সি অ্যানিমোন

ফোটো: লেখক

গল্প

কোয়াট

অরুণাভ দত্ত

সেই বিকেল থেকে শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ঝড়। ঝাড়খালির হেরোভাঙা জঙ্গলের গাছপালাগুলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় মাটিতে নুয়ে পড়ছে ক্রমাগত। প্রবল দুর্যোগে কালো হয়ে থাকা বনবাদাড়ে কাদের যেন তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখে কারা যেন হাওয়ার তালে-তালে অট্টহাস্য

করতে-করতে গাছে-গাছে মনের সুখে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখা না গেলেও তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরে ভয়ে কাঁটা হয়ে বনের মধ্যে সিঁটিয়ে রয়েছে সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর প্রাণীরা। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে-সঙ্গে মুখ তুলে ডেকে উঠছে তিন-চারটে শিয়াল। রাতের ভয়াবহতা হয়ে উঠছে প্রবল থেকে প্রবলতর।

আমার শোওয়ার ঘরের জানলার পাশেই হেরোভাঙার বনের সীমানা। বৃষ্টি নামার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝাড়খালি জুড়ে শুরু হয়েছে লোডশেডিং। ঘরের জানলা দিয়ে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলো বাইরে গিয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে একটা বই হাতে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের ভয়াবহতা দেখছিলাম। হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে ভৃত্য রামশরণের ঘরে ঢুকল। তার চোখমুখের অবস্থাও বনের ভীত প্রাণীগুলোর মতোই আড়ষ্ট। ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমার হাসি পেলেও তা দমিয়ে রেখে বললাম, "কী ব্যাপার রামশরণ? আমার রাতের খাওয়া তো হয়ে গিয়েছে। আবার কী?"

রামশরণ মিনমিন করে বলল, "কর্তা বললেন আপনার আর কিছু লাগবে কিনা জেনে আসতে। আর এটাও বলে পাঠালেন, আপনার অনুমতি নিয়ে ঘরের দরজা যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিই।"

তার এমন কথা শুনে বেশ বিরক্ত লাগল। কিঞ্জল কি আমায় খাঁচাবন্দি করতে চায়? রাগতস্বরেই বললাম, "তোমার কর্তাকে বলো, আমার আর কিছুরই দরকার হবে না। আর তাকে এও জানিয়ো, ডাক্তারবাবু গোঁয়ার হতে পারে কিন্তু কথার খেলাপ করে না। আমি তো বলেইছি বিশেষ প্রয়োজন না হলে আজ রাতে বাড়ির বাইরে বেরব না।"

আমার কথা শুনে রামশরণ চলে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে বলল, "একটা কথা বলি ডাক্তারবাবু, আজ রাতে আপনার যা-ই প্রয়োজন পড়ুক না কেন, দয়া করে বাড়ির বাইরে যাবেন না। আসলে কী জানেন তো, বাইরে বেরবার তাগিদটা কিন্তু আপনার নয়, আপনাকে বাইরে বের করার দায়িত্ব যে ডাকতে আসবে, তার।"

যে আমায় ডাকতে আসবে, সারা গ্রামসুদ্ধ সবাই আজ তারই অপেক্ষায় রাত জাগবে। সেই সকাল থেকেই শুনছি, আজ রাতে যে আমায় ডাকতে আসবে সে কোনও মানুষ তো নয়ই, এক বিশেষ ধরনের অপদেবতা। ভয়ঙ্কর তার চেহারা, রোগাটে ফিকে সবুজ রংয়ের দেহ। দেহের নীচে একটি হলদে কাপড় জড়ানো। মাথার চুল অবিন্যস্ত ও কোঁকড়ানো। হাতে কাঁটা বসানো একটি মুগুর আর কানে ঝোলে বড়-বড় মাকড়ি। তার দেহের সবচেয়ে ভয়ংকর অংশ হল বিরাট গোঁফের নীচের শয়তানি হাসি ও গোলাকার রক্তাভ দু'চোখের ধারালো দৃষ্টি। আজ রাতে এই চেহারায় সে আসবে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এবং আগামিকাল সবাই জেনে যাবে অন্য কিছু নয়, আমার মৃত্যুর কারণ হল 'কোয়াট'।

দিনতিনেক আগে কলকাতা ছেড়েছিলাম আমার বন্ধু কিঞ্জলের আমন্ত্রণে। উদ্দেশ্য ছিল, ঝাড়খালির এক প্রত্যন্ত গ্রাম হাঁসদাডাঙার মানুষজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আয়োজন করা একটি হেল্‌থ ক্যাম্পে যোগদান। ক্যাম্প প্রায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও কিঞ্জল কিন্তু আমাকে এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরতে দিল না। আমার এমনিতে তো বিশেষ ছুটি মেলে না। এই ফাঁকে সুন্দরবনের এমন একটি জায়গায় দিনকয়েক কাটালে ক্ষতি কী? তাই আমিও কয়েকদিনের ছুটি কাটাতে হাঁসদাডাঙার পোস্টমাস্টার কিঞ্জল রায়ের কোয়ার্টারেই তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি।

বেশ ভালভাবেই কাটল দু'দিন। হাঁসদাডাঙা গ্রামের সীমান্তেই হেরোভাঙার জঙ্গল। কিঞ্জলের কোয়ার্টার থেকে অল্প দূরেই। হলুদ খঞ্জনা, সিপাই বুলবুলের মতো অচেনা পাখিদের ডাকে ঘুম থেকে উঠে এক ঝলক টাটকা হাওয়ায় প্রাণভরে শ্বাস নেওয়া আর তারপরই দিশি মুরগির ডিমের সুস্বাদু পোচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্টের পর কিঞ্জলের সঙ্গেই বেরতাম। ও যেত পোস্টঅফিসে আর আমি যেতাম গোটা গ্রামটা চষে বেড়াতে। হেতাল, কেওড়া, গরান, গামুর, ওড়া, হোদো ঘেরা গ্রামটা যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনই প্রাণবন্ত। সম্প্রতি টুরিস্টদের জন্য তৈরি করা একটি পার্কে খাঁচাবন্দি বাঘও রয়েছে দেখলাম। কখনও হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাওয়া বিদ্যাধরী নদীর ধারে, যার বুক চিরে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলেছে সুন্দবনের রূপ দেখাতে। সুন্দরবন ছোট-বড় অজস্র নদীর সমাহার। কোনও-কোনও সময় কথা হত জঙ্গলে মোম-মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া মানুষজনদের সঙ্গে। শুনতাম তাদের জীবনযুদ্ধের কাহিনি, পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে যারা নিজেদের বাঘের মুখের গ্রাস করতেও পিছপা হয় না।

কেওড়া গাছের পাতা খেতে আসা হরিণের পাল, খাঁড়ির কুমির, ছোট-বড় অগুনতি নদীর টাটকা মাছ, বনমোরগের মাংস সব মিলিয়ে বনচারী হয়েই কাটাচ্ছিলাম বেশ। যেচে পড়ে গোলমালটা না পাকালে ডাক্তারি শিকেয় তুলে হয়তো এইভাবেই দিনের পর-দিন কাটিয়ে দিতাম।

রোজ সন্ধেয় কিঞ্জলের সঙ্গে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে গরম চায়ের পেয়ালা হাতে অরণ্য থেকে ভেসে আসা বাসায় ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির আর নানা জীবজন্তুর ডাক শুনতে-শুনতে আড্ডা চলত। তাতে সোৎসাহে যোগদান করতেন এখানকার ব্যবসায়ী

সমিতির কর্মকর্তা অনিমেষ লাহা। তিনি একে একে বলে যেতেন সুন্দরবনের শতাব্দীপ্রাচীন গল্পগাথাগুলো। অনিমেষবাবুর অভিজ্ঞতার স্টক অফুরন্ত। এমন সব ঘটনা শোনান যে, স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকতে হয়। মোম-মধুসংগ্রহকারী দলের সঙ্গে হেরোভাঙার বনে ঢুকে কতবার যে বাঘকে মানুষ ধরে নিয়ে

যেতে দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রায়ই বাঘের দল এই গ্রামে হানা দিয়ে মানুষ ধরে নিয়ে যায়। বুঝলাম তাই এই বাড়ির চতুর্দিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কথায়-কথায় তিনিই বলেছিলেন, সুন্দরবনের জন্তুর থেকেও শতগুণে ভয়ঙ্কর হল কোয়াট। সুন্দরবনের মানুষেরা মনে করে বনের বাঘ আর খাঁড়ির কুমির, এই দুইয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও রেহাই মেলে না কোয়াটের কবল থেকে।

কী এই কোয়াট? অনিমেষবাবু বললেন, "কোয়াট হল সাক্ষাৎ মৃত্যুর ডাক! অনেকটা নিশির ডাকের মতো বলতে পারেন। কিন্তু নিশির চেয়ে শতগুণে ভয়ংকর!"

তাঁর কথায় আমাকে কৌতূহলী হতে দেখে অনিমেষবাবু আবার বললেন, "জানেন ডাক্তারবাবু, কোয়াট হল এখানকার এক চরম প্রতিশোধপ্রবণ অপদেবতা আট-মুন্সীর আহ্বান। তিনি বনের পশুদের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁর সম্পর্কে কোনও অপমানজনক কথা বলে বা তাঁর শক্তির অবমাননা করে তা হলে তিনি তাকে চরম শাস্তি দেন। আর তাঁর শাস্তি মানেই মৃত্যু!"

"ওই কোয়াট শুনলেই মানুষ মরে যায়?" তাচ্ছিল্যের সুরেই প্রশ্নটা করি।

"কী জানেন, ডাক্তারবাবু, যার সময় ঘনিয়ে আসে, সেই-ই কোয়াট শুনতে পায়। আট-মুন্সী যার উপর প্রতিশোধ নিতে চান, গভীর রাতে তার বাড়িতে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকেন। যাকে ডাকা হচ্ছে সে যদি ডাক শুনে ঘরের বাইরে আসে তা হলে দু'-একদিনের মধ্যেই কোনও মারাত্মক রোগে ভুগে সে মারা যায়! কোনও ডাক্তার-বদ্যি তাকে বাঁচাতে পারে না। কোনও-কোনও সময় আবার এমনও হয়, আট-মুন্সী যার উপর প্রতিশোধ নেবে তাকে কোনও মানুষের দেহ ধরে দেখা দিয়ে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়, তারপর হয় নিজের হাতে, না হয় বাঘ-বাঘেল্লা দিয়ে তাকে মেরে ফেলে।"

তাঁর গল্প যে আমার এক আনাও বিশ্বাস হয়নি, আমার মুখ দেখে তা আন্দাজ করতে পেরে অনিমেষবাবু নানা রকম সত্য ঘটনার উদাহরণ দিয়ে আমার মনে আট-মুন্সীর সত্যতা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। আবদুল নামক এক গ্রামবাসীর একমাত্র দুধেলা গাইকে বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়ায় সে আট-মুন্সীকে বিস্তর শাপশাপান্ত করে। পরদিন সকালে খুব আশ্চর্যজনকভাবেই আবদুলের লাশ পাওয়া যায় হেরোভাঙার জঙ্গলের ধারে। এইরকম আরও ঘটনার বিবরণ ও অপদেবতার বিকট চেহারার বর্ণনা দিয়ে অনিমেষবাবু বললেন, "আমরা আট-মুন্সীকে খুব ভয় করে চলি। বনে ঢোকার আগে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মতো তাঁরও পুজো করি।" কোয়াট নামের

রক্তবস্ত্রপরিহিতা দ্বিভুজা দেবী কোলে একটি বাচ্চা ছেলেকে ধরে রয়েছেন এবং তাঁর পায়ের কাছে শায়িত একটি বাঘ। এই মন্দিরের কিছু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে আর-একটি জীর্ণ মন্দির দেখে হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন কেমন টেনেছিল।

মৃত্যুবাণকে দেখলাম কিঞ্জলও বেশ ভয় পায়।

মনে-মনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিতে পারতাম যদি না আজ সকালে ওই ঘটনাটা ঘটত। গ্রাম ঘুরতে বেরিয়ে দেখেছিলাম সুন্দরবনের পশু, অরণ্য ও মানুষের কল্যাণকারিণী বনবিবির মন্দির। রক্তবস্ত্রপরিহিতা দ্বিভুজা দেবী কোলে একটি বাচ্চা ছেলেকে ধরে রয়েছেন এবং তাঁর পায়ের কাছে শায়িত একটি বাঘ। এই মন্দিরের কিছু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে আর-একটি জীর্ণ মন্দির দেখে হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন কেমন টেনেছিল। সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতেই দেখেছিলাম, দু'হাত ভর্তি বুনো ফুল নিয়ে মন্দিরের দিকেই ছুটে আসা বছরদশেকের একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালিকা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা এক পুরোহিত গোছের বৃদ্ধকে ছুঁয়ে দেওয়ায় প্রচণ্ড অপমানের শিকার হয়েছে। বৃদ্ধটি প্রচণ্ড তিরস্কার করে মেয়েটিকে বলছে, "পাপী! আমি আট-মুন্সীর প্রসাদ নিয়ে বেরিচ্ছি আর তুই আমাকে ছুঁয়ে ফেললি! দেখে চলতে পারিসনে!"

দেখলাম চেঁচামেচিতে লোকজনের জমায়েত দেখে বৃদ্ধ হঠাৎ ভোল পালটে বলছে, "দেখো, আমি আটবাবার প্রসাদ নিয়ে বেরিচ্ছি আর এই ডাইনিটা দৃষ্টি দিয়েছে!" এবং সেইসঙ্গে আরও কত কী বলে উপস্থিত জনতাকে মেয়েটির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। হতভাগ্য মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়ে মাটিতে বসে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটির কোনও অপরাধই নেই, শয়তান পুরুতটি এই ছুতোয় নিজের পকেট ভরার তাগিদে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে, প্রায়শ্চিত্তের ফিরিস্তি ধরাচ্ছে এবং গায়ে হাত তুলতেও পিছপা হচ্ছে না।

হতদরিদ্র মেয়েটির উপর পুরোহিতের এই তম্বি আর বরদাস্ত করতে না পেরেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম এবং প্রতিবাদের ঝড় তুলে বিটকেল পুরুতের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম। একটি মেয়ের উপর এইভাবে অত্যাচার চালানোর দরুন পুলিশ-প্রশাসনের ভয় দেখিয়ে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে বলেছিলাম, "ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে আপনি কাউকে অপমান করতে পারেন না। আর ওকে গালি দেওয়ার আগে আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন, আপনি নিজে একজন সামান্য অপদেবতারই পূজারি, তার বেশি কিছু নন!"

এর পর পুরুত কেন, উপস্থিত আর কেউই আমার সঙ্গে কোন বিবাদে জড়ায়নি। আমি তাদের ভয়ার্ত ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়েছিলাম আর উপস্থিত সবাই, এমনকী সেই নিপীড়িত মেয়েটি পর্যন্ত তাকিয়েছিল আট-মুন্সীর মন্দিরের অন্ধকার গহ্বরের দিকে। আর আমি ওই অপদেবতার মন্দিরে ঢুকিনি। ফিরে এসেছিলাম কিঞ্জলদের কোয়ার্টারে এবং আসার পথে সেই অসহায় বাচ্চা মেয়েটি জলভরা চোখে দৌড়ে এসে আমাকে

একটা প্রণাম করেই তেমনই ছুট্টে পালিয়ে গিয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলে কিছু ঘটলে দাবানলের থেকেও দ্রুত সেই খবর চারদিকে ছড়ায়। এখানেও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা বুঝলাম, যখন কোয়ার্টারে ফিরতে কিঞ্জল আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রায় সারাটা দিন ধরে পাখি পড়ার মতো সে আমায় বোঝাল আট-মুন্সীকে অপমান করে আমি কী ভয়ানক ভুল করেছি ও তার জন্য কী শাস্তি পেতে পারি। শেষটায় প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে বন্ধু বলল যে, আজকের রাতটাই যেন আমার এখানে কাটানো শেষ রাত হয়, আগামিকাল সকালেই যেন কলকাতা ফিরি এবং কোনওদিন যেন ভুল করেও সুন্দরবনের পথ না মাড়াই।

তারপরের ঘটনা তো আগেই বলেছি, বৃষ্টিমুখর বিকেল থেকেই আমি ঘরবন্দি। অনিমেষবাবু আজ আর আসেননি। রামশরণের মুখে শুনলাম তার ছেলের নাকি খুব অসুখ। বেরিয়ে যে একবার রোগীকে দেখে আসব তারও উপায় কিঞ্জল রাখেনি। বসে-বসে শুধু প্রহর গুনছি।

রাত সাড়ে এগারোটা। বাইরে ঝড়ের সঙ্গে কমেছে বৃষ্টির দাপটও। ঝমঝম থেকে ঝিরঝির ধারায় পতন। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টিভেজা ঠান্ডা বাতাস শরীরে আলস্য ধরাচ্ছে। জঙ্গলের কোনও এক প্রান্তে শুরু হল শিয়ালের চিৎকার আর সেই ডাকেরই তালে-তালে হ্যারিকেনের আলোয় আমার ছায়া দেওয়ালে পড়ে প্রেতের মতো নাচছে। এছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ।

হাতের বইটা বন্ধ করে একটু শোওয়ার উপক্রম করেছি। হালকা ঘুমের আমেজ চোখে নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার কানে এল একটা মৃদু অথচ আকুল চিৎকার, "ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু!" চকিতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম। এ কণ্ঠ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। ইনি অনিমেষবাবু ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারেন না। শব্দটা আসছে সদর দরজা থেকে। হন্তদন্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে নামতে যাচ্ছি, শুনলাম মনের অতল গহ্বর থেকে কে যেন বলছে 'বাইরে যেয়ো না মূর্খ! পাগলেও নিজের ভাল বোঝে। প্রাণটা হারাতে না চাইলে বাইরে যেয়ো না!' কিন্তু আমার কমন সেন্স সক্রিয় হয়ে জানান দিচ্ছে, 'ছি ছি! আমি না ডাক্তার! মানুষের সেবাই আমার ব্রত। আর আমি কিনা মনগড়া একটা ভয়ের কারণে বাইরে যেতে পারছি না? যখন আমি খুব ভাল করেই জানি যে, অনিমেষবাবু ছেলের অসুখের জন্যই এত রাতে এইভাবে ছুটে এসেছেন। এখন যদি আমার কলকাতার বাড়ির বাইরে এইভাবেই কেউ আমায় ডাকত, তবে

কি আমি পারতাম অপদেবতার ভয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে?' এত সব ভাবনা মনে আসতেই মুহূর্তে মনটা চাঙা হয়ে উঠল।

বাইরে বেরিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে চেয়ে রয়েছেন অনিমেষবাবুই। আমাকে দেখেই কেঁদে পড়লেন, "ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটাকে বাঁচান! সকাল থেকেই তার জ্বর। এখন জ্বর মাথায় উঠে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মাথায় জল দিলেও কিছুতেই হুঁশ ফিরছে না!"

আমি তিলমাত্র দেরি না করে ঘরে ঢুকে তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে! সদর দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ! তা হলে তিনি ভিতরে এলেন কী করে? তবে কি রামশরণ দরজা বন্ধই করেনি? তা ছাড়া অনিমেষবাবু এতক্ষণ ধরে ডাকছেন, অথচ আমি ছাড়া বাড়ির কেউই কি শুনতে পায়নি? একটা ভ্রান্ত ধারণা মনের ভিতর জন্ম নিচ্ছে দেখে জোর করে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, 'একটা ছোট ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আর আমি আহাম্মকের মতো এইসব কী ভেবে চলেছি!' ডাক্তারি সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে সদরটা ভেজিয়ে রেখে অনিমেষবাবুর সঙ্গে বেরলাম।

রাস্তা অত্যন্ত পিছল। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পথ দেখে খুব সাবধানে এগোচ্ছি। অনিমেষবাবুর সাবধানতার বালাই নেই। দ্রুত হাঁটছেন। মনে যেন এক গভীর উৎকণ্ঠা। যেন খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না। বুঝলাম ছেলের জন্য খুবই চিন্তিত।

ইঁটের তৈরি রাস্তা থেকে মেঠো পথে নেমে এলাম। চলতে গিয়ে কাদায় পা বসে যাচ্ছে। রাস্তা ক্রমশ ঢালু হয়ে আসছে। ঘরবাড়িও বিশেষ চোখে পড়ছে

না। দু'ধারের গাছপালা আরও সন্নিবদ্ধ হচ্ছে। ওই আবার শুরু হল শেয়ালের ডাক। এবারের শব্দটা যেন আরও কাছে। ক্রমে অন্ধকার আরও নিবিড় হল। চারপাশটা দেখে বুঝলাম অনেক আগেই আমরা হেরোভাঙার বনে ঢুকে পড়েছি, যেখানে রাত্রে ঢুকতে অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপে। অনিমেষবাবু কি এখানে থাকেন? তাঁর হাঁটার গতি দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। এত অন্ধকারেও রাস্তা ভুল হচ্ছে না। ঠিক এক-একটা গাছের সারি ধরে এগোচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে দেখছেন আমি আসছি কিনা।

এইবার আমার মনে ভয়ের ক্ষীণ একটা আভাস ফুটে উঠল। দেখি অনিমেষবাবু বাতাস শুঁকে-শুঁকে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছেন। নিজের বাড়ি নিশ্চয়ই কেউ বাতাস শুঁকে খোঁজে না! তবে কীসের সন্ধান করছেন তিনি? যেন এই পথ দিয়েই একটু আগেই কেউ চলে গিয়েছে আর তারই খোঁজ চালানোর চেষ্টা করছেন গায়ের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে। টর্চের আলো মাটিতে পড়তে দেখি নরম কাদা জুড়ে টাটকা অনেক পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। ছাপগুলো মানুষের তো নয়ই, জলজ্যান্ত একটা বাঘের! ভয়ে গলাটা শুকিয়ে এল যখন বুঝলাম কিছুক্ষণ আগেই এই পথ দিয়েই বাঘটা হেঁটে গিয়েছে। শুনেছিলাম বাঘ যখন শিকারকে লক্ষ করে ওত পেতে থাকে, শিকার তখন বাঘের গায়ের গন্ধ পায় না। পাচ্ছি না আমিও। তবে কি...

থমকে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় ডাকলাম, "অনিমেষবাবু!" দেখি তিনিও আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন। তারপর আমারই মতো ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠলেন, "দেখছেন, ওখানে কে দাঁড়িয়ে?" দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য! আমাদের থেকে বিশ গজ দূরত্বে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত নারী! আকাশের দিকে মুখ তুলে কীসের যেন প্রতীক্ষায় রত। আমদের পদধ্বনি শুনে সেই নারীমূর্তি মুখ ফেরায় আমাদের দিকে। শ্যামবর্ণা, একটা টকটকে লাল শাড়ি সাঁওতাল মেয়েদের মতো করে পরা, কপালের লাল সিঁদুরের টিপটা আগুনের মতো জ্বলছে, সিঁথিভর্তি সিঁদুর, চুলের খোঁপায় বিচিত্র বনফুলের মালা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তার গা থেকে একটা নীলচে নরম আলো বেরিয়ে রাতের অরণ্যকে আলোকিত করে রেখেছে।

সেই নারী তারপর ধীর পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তার মতলবটা আন্দাজ করতে না পেরেই অজানা ভয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ আমার ঠিক পাশেই আর-একটি আলোর ছটা দেখে চমকে

যেখানে কিছুক্ষণ আগেও অনিমেষবাবু ছিলেন, সেখানে এখন যিনি রয়েছেন, তার রোগা শরীরের রং ফিকে সবুজ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, গোলাকার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর হাতের কাঁটাওয়ালা মুগুর দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না যে ইনিই আট-মুন্সী!

মুখ ফেরাতেই আমার দমটা যেন গলায় এসে আটকে যায়! সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে গায়ের লোম! সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি যেখানে কিছুক্ষণ আগেও অনিমেষবাবু ছিলেন, সেখানে এখন যিনি রয়েছেন, তার রোগা শরীরের রং ফিকে সবুজ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, গোলাকার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর হাতের কাঁটাওয়ালা মুগুর দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না যে ইনিই আট-মুন্সী! অপদেবতাকে দেখেই সেই অদ্ভুত নারীটি দু'হাত তুলে হুঙ্কার ছাড়ে, "এই শয়তান, চলে যা! চলে যা বলছি!" কী ভয়ঙ্কর সে কণ্ঠ! গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়!

গর্জন শুনেও আটের নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। যেন নিজের কাজ শেষ না করে সে কিছুতেই যাবে না। এইবার নারীটি আগের চেয়ে আরও ভয়ানক হয়ে উঠে রাগে মুখ বিকৃত করে সেই হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে ধেয়ে আসতে থাকে আমারই দিকে। তার এমন ভয়ানক রূপ দেখামাত্র ঘটনার মোড় ঘুরে গিয়ে আট-মুন্সীর শরীরটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করে বনবাদাড় ভেদ করে পিছনবাগে দৌড়তে থাকে। সেইসঙ্গে সেই নারীমূর্তিও হাওয়ার বেগে ছুটতে-ছুটতে ধাওয়া করে অপদেবতাকে। আমার পাশ দিয়ে একঝলক গরম বাতাস বয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নীলচে আলো মিলিয়ে গিয়ে আবার নেমে আসে অন্ধকার।

এইবার আমার খুব কাছেই যে ডাকটা শুনলাম, তাতে আমার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। সেটা শিয়ালের নয়, স্পষ্ট বাঘের! তারপর শুধু ছুটে চলা। গাছের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়া, আবার ওঠা, ফের দৌড়। বেশ বুঝতে পারছি পিছনে কী যেন তাড়া করে আসছে। একসময় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে চোখে পড়ে একদল মানুষ ছোট্ট একটা নদীর ধার দিয়ে আলো হাতে "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু..." বলে হাঁকতে-হাঁকতে এগিয়ে চলেছে। আমিও জোর গলায় প্রত্যুত্তর দিয়ে নদীর জল পেরিয়ে ছুটে যাই আলোর দিকে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে পড়ে।

জ্ঞান ফিরল বনবিবির মন্দিরে। আমার অনুসন্ধানকারী দলের মধ্যে ছিল রামশরণ। সেই-ই মাঝরাতে উঠে আমার ঘর খালি দেখে ডাকাডাকি করে লোক জড়ো করে। তারপর জঙ্গলধারের নদীর কাছে চিৎকার শুনে আমাকে উদ্ধার করে আনা হয়। দলের মধ্যে থেকে একজন বলে, "খুব বেঁচে গিয়েছেন। না হলে কোয়াট শুনে বেঁচে ফেরা কি মুখের কথা! তবু অমঙ্গলটা যদি আটকানো যেত!" অমঙ্গলটা যে কী, তা দেখলাম নিজের চোখেই। বনবিবির মন্দিরের দরজা খোলা, গর্ভগৃহের বেদি শূন্য! বনবিবির বিগ্রহ হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! এই একই অবস্থা আট-মুন্সীর মন্দিরেও!

ছবি: বৈশালী সরকার

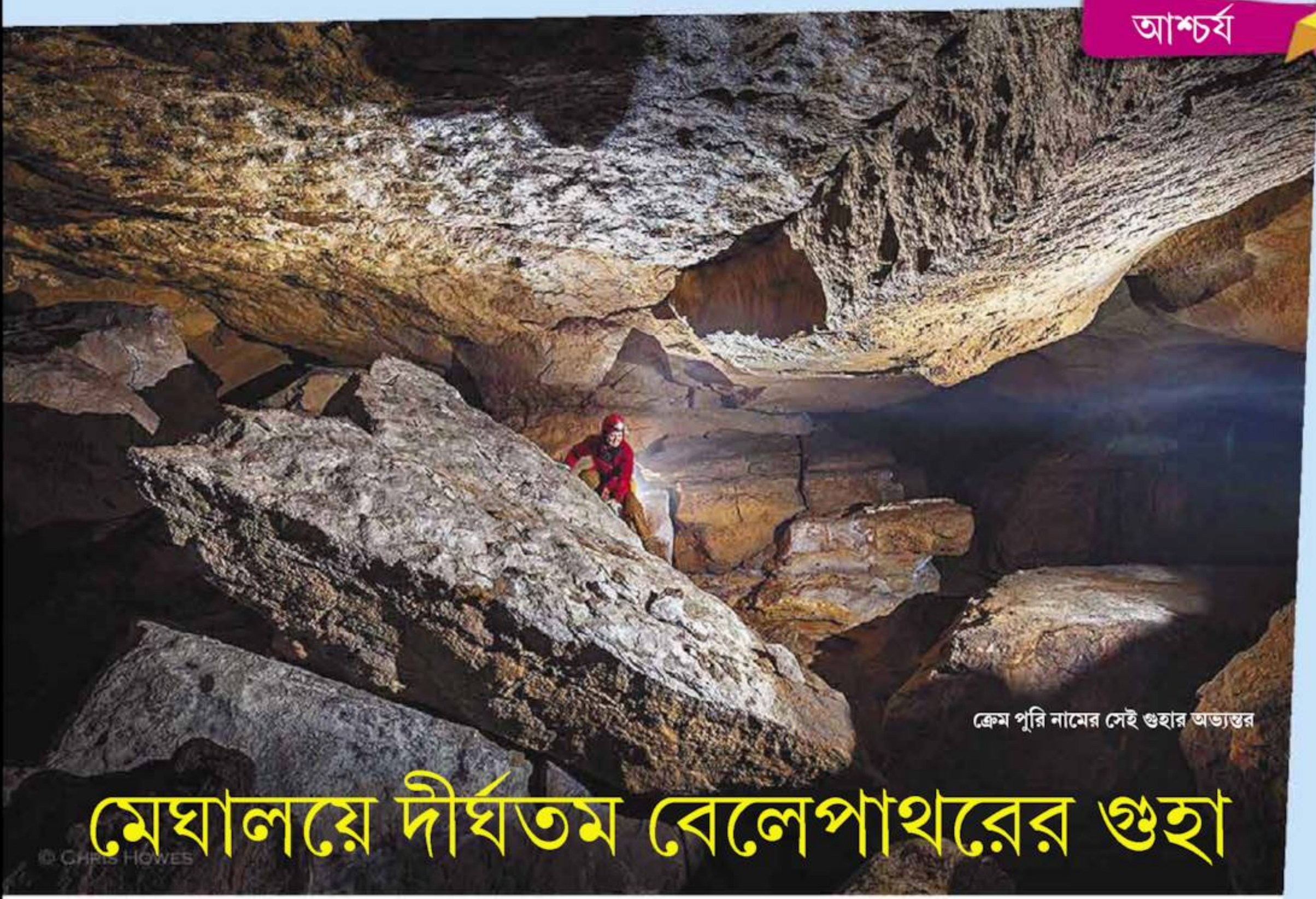

ক্রেম পুরি নামের সেই গুহার অভ্যন্তর

মেঘালয়ে দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা

এভারেস্টের দৈর্ঘ্যের চেয়েও লম্বা এই গুহায় পাওয়া গিয়েছে ডায়নোসরের জীবাশ্ম। লিখেছেন অচ্যুত দাস

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বে মেঘালয়ের পাহাড়পর্বতের তলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৬৫০টি গুহা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার গুহায় ইতিমধ্যেই খানাতল্লাশি সেরে ফেলেছে মেঘালয় অ্যাডভেঞ্চারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এম এ এ)। সেই খোঁজপর্বেই ২০১৬ সালে একটি বেলেপাথরের গুহা খুঁজে পাওয়া যায়, যার নাম দেওয়া হয় ‘ক্রেম পুরি’ (খাসি ভাষায় ‘ক্রেম’ মানে গুহা)। সম্প্রতি, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ, এম এ এ-র উদ্যোগে চার ইতালীয় বিজ্ঞানী এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের ৩০ জন অভিজ্ঞ গুহা-অনুসন্ধানকারীর একটি দল ক্রেম পুরির ভিতরে ঢুকে অনুসন্ধান শুরু করেন। আর তারপরই জানা যায়, বিশ্বে এর চেয়েও লম্বা বেলেপাথরের গুহা হয় একটিও নেই, আর যদি বা থাকেও, তাকে এখনও খুঁজে বের করা যায়নি। ক্রেম পুরির দৈর্ঘ্য কতখানি? বিশ্বের দীর্ঘতম পাহাড় মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কত জান তো? প্রায় ৮,৮৫০ মিটার। ক্রেম পুরির দৈর্ঘ্য প্রায় তার তিন গুণ, ২৪,৫৮৩ মিটার! মানে, গুহার লেজা থেকে শুরু করে মুড়ো পর্যন্ত পৌঁছতে পেরতে হবে পাক্কা ২৪.৫ কিলোমিটার রাস্তা!

এর আগে বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহার রেকর্ড ছিল দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার কুয়েভা ডেল সামান-এর, যার দৈর্ঘ্য ১৮.২ কিলোমিটারের কাছাকাছি। যে-কোনও রকম গুহার কথা যদি বলো, তা হলে এদেশের সবচেয়ে লম্বা গুহাটিও আছে মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। ৩১ কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা সেই চুনাপাথরের গুহার নাম ক্রেম লিয়াত প্রাহ-উমিম-লাবিট। এই লম্বা গুহাটির কথা মাথায় রাখলে ক্রেম পুরি হয়ে যাবে এদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম গুহা।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাথার মধ্যে প্রশ্ন আসছে, গুহা নিয়ে যেখানে কথা হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পাশের ছবিতে একটা রাক্ষুসে ডায়নোসরের ছবি দেওয়ার কারণ কী? আগে বলি এই দৈত্যাকৃতি ডায়নোসরের নাম, মোসাসরাস। এর ছবি দেওয়ার কারণ, ক্রেম পুরি-র মধ্যে যেসব ডায়নোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ওই মোসাসরাস। এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৫ মিটার, ওজন ১৪ হাজার কেজির কাছাকাছি! জলচর এই মাংসাশী সরীসৃপ সমুদ্রের তলায় ঘুরে বেড়াত প্রায় সাতকোটি বছর আগে। গুহার মধ্যে তার যে জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে, তা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, কোটি বছর আগে কি তবে মেঘালয়ের এই জায়গাগুলো সব জলের তলায় ছিল?

ধারাবাহিক উপন্যাস - পর্ব ২

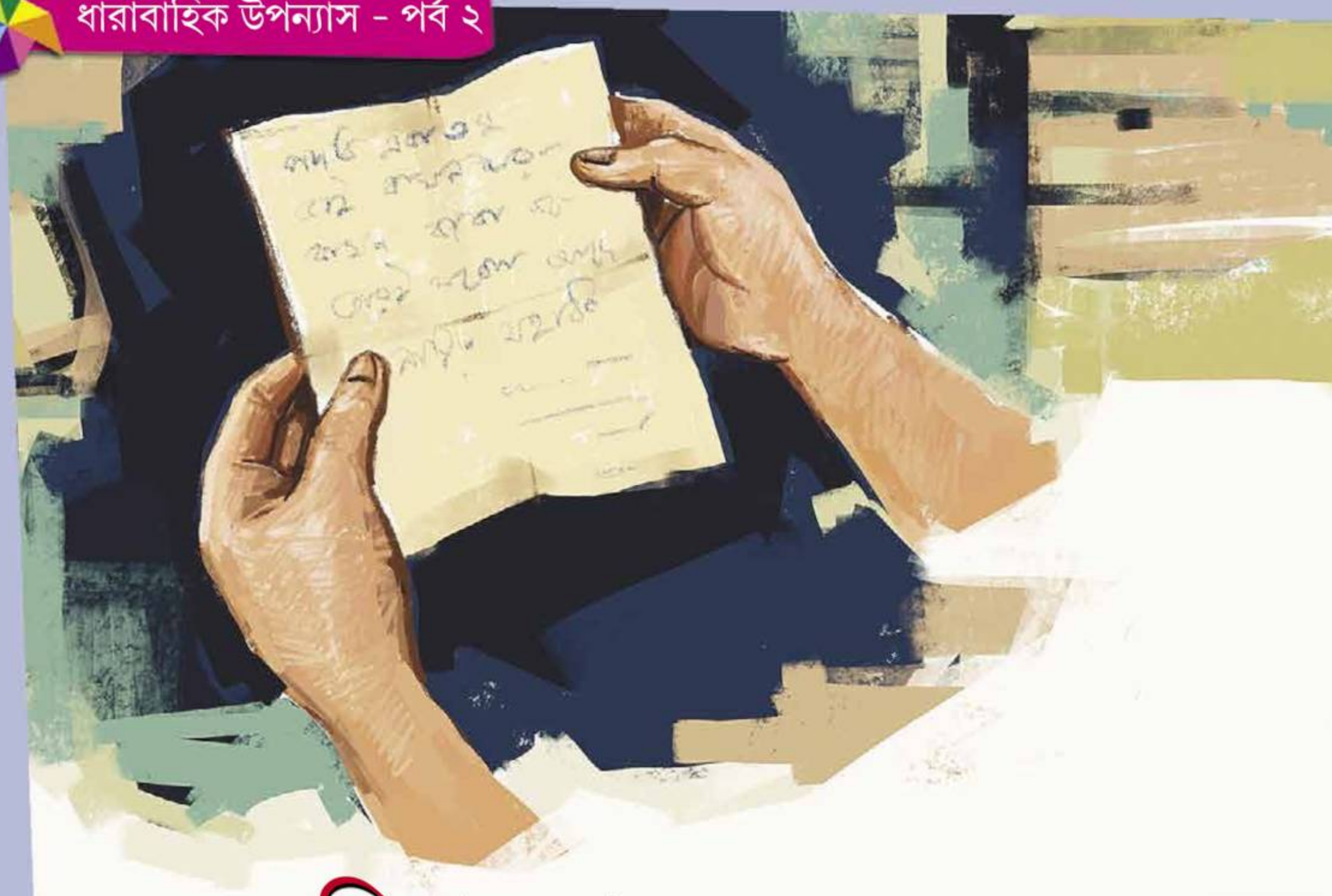

বিষাবতার

জিৎ সরকার

*(**আগে যা ঘটেছে :** মার্কুইস স্ট্রিটে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধা ছবি সেনের। সেই মৃত্যুকে খুন বলেই মনে হচ্ছিল পুলিশের। এবার সেই ঘটনার তদন্তে নামল লালবাজারের দুঁদে অফিসার ঋজু। সঙ্গে নিল তার ভাই প্রবরকে। মৃতার ছেলে বাদল সেনকে দিয়েই শুরু হয় পুলিশ ও গোয়েন্দার প্রশ্নোত্তর পর্ব।)*

প্রবর সমস্ত জিনিসপত্র নেড়ে দেখল। রাইটিং প্যাডটা আলোর সামনে ধরে দেখল। যেই হেনরির বইটা একটু উলটে-পালটে দেখতে গিয়েছে, অমনি একটা ভাঁজ করা কাগজ বইয়ের মধ্যে থেকে নীচে পড়ে গেল। প্রবর কাগজটা কুড়িয়ে নিল। ঈষৎ হলুদ রংয়ের বেশ মোটা কাগজ। কাগজটা খুলে দেখে তাতে পরিষ্কার হাতের লেখায় লেখা,

‘পদবি এক তবু
ভাই নয়কো মোটে।
চাঁদ কখনও শরৎকালের
কখনও বাঁকা বটে।
তারই মাঝে রাখা আছে
গাড়ির মহাধন।
‘জ’ কেটে যদি ‘চ’ করো
বাঁধব বাছাধন।
খোলার চাবি আমার কাছে
আছে তুমি জান।
সাগরমাঝে মানিক যাহা
পয়সা দিয়ে কেনো।’

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে প্রবর ড্রয়িংরুমে বেরিয়ে এল। বাড়ির সকলেই ড্রইংরুমে উপস্থিত। প্রবর ঋজুকে বলল, “দাদা, তোর সব কাজ কমপ্লিট?”

“হ্যাঁ। তোর?”

“আপাতত বাদলবাবু, মনে হয় আমাকে আবার

এবাড়িতে আসতে হবে। তখনও নিশ্চয়ই আপনারা এভাবেই আমাকে সাহায্য করবেন।”

বাদলবাবু বললেন, “নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার মাকে যে কেউ মারতে পারে, একথা বিশ্বাসই হয় না। আর মারবেই বা কেন?”

ঋজু বলল, “সেসব তদন্ত শেষ হলেই জানা যাবে। বাদলবাবু, মৃত্যুর সময় আপনার মায়ের গায়ে যে গয়নাগুলো ছিল, সেগুলো আমরা এখন টেস্টের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। দরকার মিটে গেলে আপনাদের জানিয়ে দেব, থানা থেকে তুলে নিয়ে আসবেন।”

বাদলবাবু ধরা গলায় বললেন, “ঠিক আছে। তবে স্যার, ওর মধ্যে যে মুক্তোর আংটিটা আছে, সেটা একটু সাবধানে রাখবেন। ওটা আমার মায়ের খুব প্রিয়।”

ঋজুর ভুরু কুঁচকে গেল, “কই, আমরা তো কোনও মুক্তোর আংটি পাইনি।”

অবাক হলেন বাদলবাবু, “সে কী! মা তো ওই আংটিটা সব সময় বাঁ হাতের তর্জনীতে পরে থাকতেন। একটা মুহূর্তের জন্যও মা ওটাকে কাছছাড়া করতেন না।”

প্রবর বলল, “আংটিটা খুব দামি?”

মাথা নাড়লেন বাদলবাবু, “একেবারেই না। খুব সাধারণ একটা মুক্তো। তবু ওটা মায়ের খুব পছন্দ ছিল।”

ডুকরে কেঁদে উঠলেন নীতাদেবী, “একটা আংটির জন্য কে আমার মাকে মারল?”

ঋজু নীতাদেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, “আংটির জন্যই যে ছবিদেবী মারা গিয়েছেন, এমনটা কেন ভাবছেন? হয়তো অসাবধানে কোথাও খুলে পড়েছে। আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখুন।”

প্রবর সেন্টারটেবিল থেকে একটা রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে তাতে খসখস করে নিজের ফোন নম্বরটা লিখে দিল। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে বাদলবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এই নিন। এটা আমার পার্সোনাল নাম্বার। আংটিটা পাওয়া গেলে বা কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে আমাকে জানাবেন।”

॥ ৪ ॥

গাড়ি চলতে শুরু করলে প্রবর বলল, “ডাঃ চ্যাটার্জি কী বললেন?”

“ফোন পাওয়ার মিনিটকুড়ির মধ্যেই উনি চলে আসেন। উনি আসার আগেই ছবিদেবীর মৃত্যু হয়। ইনফ্যাক্ট, ওঁর কথা অনুযায়ী সুপ খেয়ে ঢলে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ছবিদেবীর মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর কারণ বিষ।”

“আমারও সেটাই মনে হয়। এত কুইক কাজ হয়েছে, খুব সম্ভবত বিষটা সায়ানাইড। ভিসেরার পর শিওর হওয়া যাবে।”

“আমার এখন মনে হচ্ছে, খুনটা বাদলবাবুই করেছে। একজন কেমিস্ট্রি টিচারের পক্ষে সায়ানাইড জোগাড় করাটা মুদিখানার জিনিস কেনার চেয়েও সহজ। আবার হয়তো কোনও অছিলায় ওই অনীকই সুপে সায়ানাইড মিশিয়েছে। তারপর ছবিদেবীর শ্বাসকষ্টের

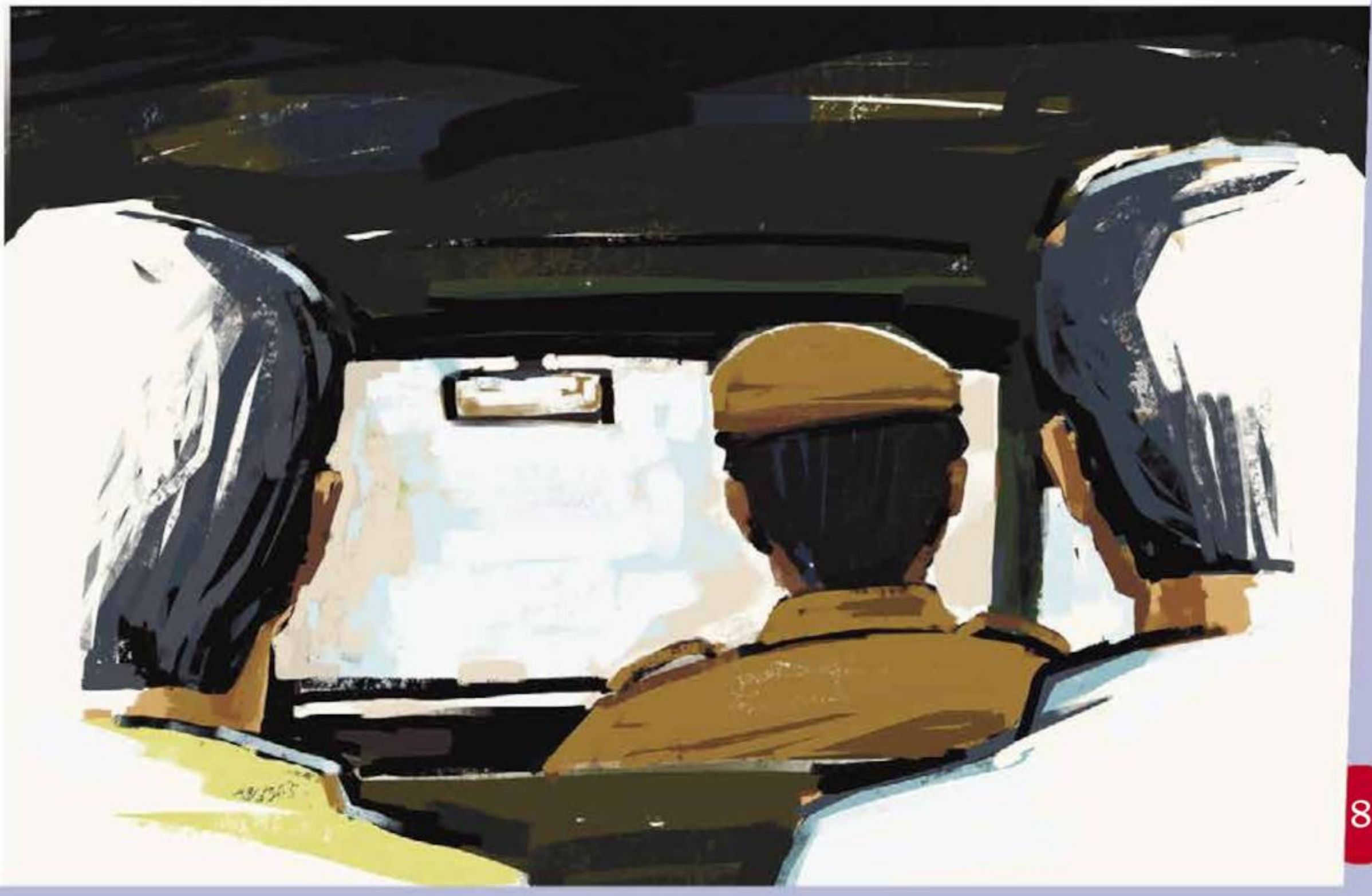

অজুহাত খাড়া করে সটকেছে।"

"বিষটা যে সুপেই ছিল, সে ব্যাপারে এখনই এত নিশ্চিত হচ্ছিস কী করে? তা ছাড়া, বাদলবাবু না হয় সম্পত্তি পাওয়ার আশায় মাকে খুন করেছেন। কিন্তু অনীক? ওর খুন করার মোটিভটা কী?"

"আরে, ওই মুক্তোর আংটিটা!"

প্রবর ঠোঁট ওলটাল, "ধুস। সস্তা একটা মুক্তোর আংটির জন্য একটা লোক সায়ানাইড দিয়ে কাউকে মারতে পারে? না রে দাদা! বিষয়টা এত সোজা নয়।"

ঋজু মুখ বেজার করে বলল, "তুই সহজ বিষয়কেও কঠিন করে ফেলিস। আর সুপ ছাড়া আর কীভাবে বিষটা ছবিদেবীর শরীরে গেল? উনি তো তখন আর কিছুই খাননি।"

"আমিও তো সেটাই ভাবছি! ঠিক আছে... এইটা দেখ," বলে প্রবর তার প্যান্টের পকেট থেকে ছড়া লেখা কাগজটা বের করে ঋজুর হাতে দিল।

ঋজু বারকয়েক বিড়বিড় করে ছড়াটা পড়ে চোখ গোল-গোল করে বলল, "এর মানে? আর তুই এটা পেলি কোথা থেকে?"

"এটা আমি ওবাড়ি থেকে পেয়েছি। আর মানেটা কী, সেটা আমিও ভাবার চেষ্টা করছি। তবে এ নিয়ে চিন্তা করে ব্রেনকে ড্রেন করে ফেলার দরকার নেই। হয়তো এটা নিছকই একটা ছেলে-ভোলানো ধাঁধা।"

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে, প্রবর জানলার বাইরে তাকাল। বাড়ি এসে গিয়েছে। এবার নামতে হবে। কথায়-কথায় কখন যে বাড়ি এসে গিয়েছে, ওরা খেয়ালই করেনি।

প্রবর গাড়ি থেকে নেমে বলল, "তুই কি এখন অফিস যাবি?"

"হ্যাঁ, এখন এগুলোকে ফরেনসিকে পাঠাতে হবে, রিপোর্ট বানাতে হবে, কাজ আছে।"

প্রবর ফস করে প্যান্টের পকেট থেকে ওর নিজের রুমালটা প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বের করে বলল, "এটাও ফরেনসিকে পাঠা।"

ঋজু হেসে বলল, "ফাজলামো করছিস? ভেবেছিস প্যাকেটে ভরলে তোর রুমাল আমি চিনতে পারব না?"

প্রবর কিন্তু সিরিয়াস গলায় বলল, "এটা আমারই রুমাল। কিন্তু যা বলছি তাই কর। এটা টেস্টে পাঠা।"

ঋজু বুঝতে পারল, ও সিরিয়াস। ও প্যাকেটটা নিল। ও দেখল প্রবর টলমল পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষণ ওর চেনা। প্রবর এখন অতল চিন্তায় নিমগ্ন। না, কেসটা মনে হচ্ছে সত্যিই জটিল।

॥ ৫ ॥

প্রবর আর ঋজু এখন দাঁড়িয়ে আছে অনীক দত্তর বাড়ির সামনে। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গায় বাহারি ফুলের গাছ লাগানো থাকলেও অধিকাংশটাই আগাছায় ভরা। বাড়িটাও পুরনো-পুরনো। পলেস্তারা খসা।

দরজায় বেল নেই। কড়া নাড়ায় দরজা খুলেছে এক সুদর্শন যুবক। পুলিশ দেখে মুখটা একটু বিবর্ণ হলেও পরক্ষণেই সাজানো দাঁতের পাটি বের করে হেসে বলল, "ইয়েস?"

ঋজু কাঠখোট্টা গলায় বলল, "ছবিদেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। আপনিই অনীক?"

ছেলেটির মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে বলল, "হ্যাঁ, ছবিদেবীর মৃত্যুটা খুবই স্যাড ইনসিডেন্ট। কিন্তু এমনই আমার ভাগ্য, আমি কিছুই করতে পারলাম না।"

ঋজু কাঠখোট্টা গলায় বলল, "ছবিদেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। আপনিই অনীক?" ছেলেটির মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে বলল, "হ্যাঁ, ছবিদেবীর মৃত্যুটা খুবই স্যাড ইনসিডেন্ট। কিন্তু এমনই আমার ভাগ্য, আমি কিছুই করতে পারলাম না।"

প্রবর বলল, "আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?"

অনীক বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসুন।"

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা সরু প্যাসেজ। তার পাশে দু'-তিনটে ঘর। প্রথম ঘরটায় ওদের নিয়ে ঢুকল অনীক। খুব সাধারণ, কিন্তু বেশ ছিমছাম ঘরটা।

অনীক বলল, "এটা আমার মায়ের ঘর।"

প্রবর খাটে বসতে-বসতে বলল, "খাটটা যে দেখছি একেবারে জানলার ধার ঘেঁষে।"

অনীক বলল, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর নির্দেশ। আসলে আমার মা ক্রনিক শ্বাসকষ্টের রোগী। তাই যত প্রাকৃতিক হাওয়া-বাতাসের মধ্যে থাকবেন, ততই ভাল। এই জানলাটা তো চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।"

প্রবর চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল, "আপনার মা এখন কেমন আছেন অনীকবাবু?"

"বেটার। মাকে কালই নার্সিংহোম থেকে রিলিজ় করে দিয়েছে।"

ঋজু জিজ্ঞেস করল, "আপনার মা এখন তো তা হলে বাড়িতেই আছে। ওঁর সঙ্গে কি একবার দেখা করা যাবে?"

"আমার মা বাড়িতে নেই। আমার দিদি আজ সকালেই মাকে নিয়ে বর্ধমানের ট্রেনে উঠে গিয়েছে। ওখানেই দিদির শ্বশুরবাড়ি। মা আপাতত সেখানেই ক'দিন থাকবেন।"

একটু ভেবে অনীক বলল, "তবে যদি কোনও প্রয়োজন থাকে, আমি আপনাদের সঙ্গে মায়ের ফোনে কথা বলিয়ে দিতে পারি।"

প্রবর বলল, "না। তার কোনও দরকার নেই।"

দেওয়ালে যার ফোটো ঝুলছে তিনিই বোধ হয় অনীকের মা। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য প্রবর জিজ্ঞেস করল, "এটা আপনার মায়ের ফোটো?"

"হ্যাঁ।"

"নতুন বাঁধিয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আসলে পুরনো ফ্রেমটা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখান-ওখান থেকে খসে পড়ছিল। এই তো সপ্তাহখানেক আগে বাঁধিয়ে এনেছি।"

পাশেই আর-একটা ফোটো টাঙানো। অনীক তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফোটোটা দেখতে-দেখতে প্রবর বলল, "এটাই মনে হচ্ছে রিসেন্ট তোলা।"

"হ্যাঁ। দিনপনেরো আগে এই ঘরেই ফোটোটা তোলা। দুটো ফোটো একসঙ্গে বাঁধিয়ে এনেছি।"

প্রবর এবার সরাসরি অনীকের দিকে তাকিয়ে বলল, "পরশুদিন, অর্থাৎ যেদিন ছবিদেবী মারা যান, সেদিন আপনি ওবাড়ি উপস্থিত ছিলেন। আপনি কি ওঁর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলেন?"

"না। উনি একদমই সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন। বাদলবাবু পরে যখন ফোনে আমাকে জানালেন উনি খুন হয়েছেন, আই ওয়াজ় শকড। আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় হঠাৎ কোনও স্ট্রোক বা ওই জাতীয় কিছু হয়েছে।"

"সে কী! ওঁর মুখ থেকে তো গ্যাঁজলা বেরচ্ছিল।"

"হ্যাঁ। কিন্তু অনেক সময় তো স্ট্রোকের পরও ওরকম হয়।"

"হুম... সেটা ঠিক," একটু ভেবে প্রবর বলল, "ওবাড়ির মানুষদের আপনার কেমন মনে হয়?"

"দেখুন, আমি যাই, কাজ করি, চলে আসি। কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় না। এক, বাদলবাবু কখনও-সখনও আসেন, দু'-একটা কথা বলেন। নেহাতই ফর্মাল কথাবার্তা। আর ছবিদেবী কথা বলতেন। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত আমাদের।"

তিরের মতো প্রশ্ন করল প্রবর, "আর রূপাদেবী?"

তিরের ফলাটা বোধ হয় একটুও আঘাত করতে পারল না অনীককে। হাসিমুখেই উত্তর দিল, "ওকে আমি নিজের বোনের মতো দেখি। রূপা ভীষণ পাংচুয়াল, কেয়ারিং আর রেসপন্সিবল। গত রাখিতে ও আমাকে রাখি পরিয়েছিল। আমার ডায়েরিতে এখনও সেই রাখি রাখা আছে।"

"আপনার সঙ্গে বাদলবাবুর আলাপ কীভাবে হল?" প্রবর চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করল।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে অনীক বলল, "আমার সঙ্গে আগে আলাপ হয় ছবিদেবীর। উনি যে মঠে মাঝেমধ্যে নামগান শুনতে যেতেন, আমি নিয়মিত সেখানে যেতাম।"

প্রবর বলল, "কত বছর ধরে আপনারা মঠে যাচ্ছেন?"

একটু ভেবে অনীক বলল, "আমি যাচ্ছি বছরদেড়েক আর ছবিদেবী বোধ হয় মাসছয়েক মতো।"

ঋজু বলল, "তার মানে আপনার সঙ্গে ওঁর ভাল সম্পর্ক ছিল।"

অনীক ঘাড় নেড়ে বলল, "সেটা ছিল। মাঝে একটা ব্যাপারে খালি একটু... সে যাক।"

মনে-মনে উৎসুক হয়ে উঠলেও বাইরে শান্ত ভাব বজায় রেখে প্রবর বলল, "কী ব্যাপার হয়েছিল?"

"তেমন কিছু না। ম্যাডামের কাছে অনেক পুরনো মনুসংহিতার এডিশন আছে। আমি সেটা কিছুদিনের জন্য চেয়েছিলাম। ম্যাডাম দেননি। বলেছিলেন, ওটা ছাড়া উনি অন্য যে-কোনও জিনিস দিতে রাজি আছেন। একটু খারাপ লেগেছিল, কিন্তু মনকে এটা ভেবে প্রবোধ দিয়েছিলাম, জিনিসটা ওঁর। দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ ওঁর ইচ্ছে।"

"এই ঘটনাটা ওবাড়ির আর কেউ জানে?"

"বাদলবাবু জানেন। একদিন ম্যাডামের ঘরে ঢুকতে গিয়ে উনি কিছুটা শুনতে পান। পরে আমাকে ডেকে উনি জিজ্ঞেস করাতে আমিই সব কিছু বলি। উনি আমাকে বলেন, বইটার আশা যেন আমি ছেড়ে দিই। ছবিদেবী নাকি অসম্ভব জেদি।"

প্রবর চোখ সরু করে বলল, "আপনি তার মানে একাধিকবার ছবিদেবীকে এই বইটার কথা বলেন।"

অনীক একটু অপ্রস্তুত মুখে বলল, "হ্যাঁ। তবে বাদলবাবু বলার পর থেকে আমি আর এ বিষয়ে কথা বলিনি।"

প্রবর মাথা নাড়ল, "হুম। অনীকবাবু এবার একটু আপনাদের পারিবারিক প্রসঙ্গে আসি। আপনার বাবা মারা গিয়েছেন কতদিন আগে?"

ভারী অবাক হয়ে গিয়েছে অনীক। বলল, "বছরচারেক আগে। কিন্তু আপনি কী করে বুঝলেন? এই ঘরে তো আমার বাবার ফোটো নেই।"

ভাবলেশহীন মুখে প্রবর বলল, "দরজার বাইরে নেমপ্লেটে আপনার বাবার নামের উপর চন্দ্রবিন্দু আছে। আপনার বাবা কী কাজ করতেন?"

"একটা বেসরকারি ফার্মে হিসেবপত্র রাখার কাজ করতেন।"

"আর আপনি কী কাজ করেন?"

"সেভাবে কোনও জব নেই। ক'টা টিউশনি পড়াই, কিছু স্কুলটিচারের হয়ে মাঝে-মাঝে পরীক্ষার খাতা দেখে দিই। তবে চাকরির চেষ্টায় আছি। সেকেন্ড ডিভিশনে গ্র্যাজুয়েশন করেছি, যা হোক জুটে ঠিক যাবে।"

"আচ্ছা। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। ছবিদেবীর মৃত্যুর পর থেকে ওঁর সর্বক্ষণের মুক্তোর আংটিটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বাদলবাবু বলেছেন।"

"বেশ। আপনি এবার বলুন তো শেষ যখন আপনি ছবিদেবীকে দেখেছিলেন, তখন কি আপনি তাঁর হাতে আংটিটা দেখেছিলেন?"

খানিকক্ষণ ভাবল অনীক। তারপর বলল, "উঁহু। আসলে তখন এমন একটা সময়! এসব খেয়াল করিনি।"

প্রবর মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই, আপনি একটা কাগজে আমার নাম আর ফোন নাম্বারটা লিখে নিন। যদি ওবাড়ির সম্পর্কে কোনও বিশেষ কিছু মনে পড়ে, তা হলে আমাকে জানাবেন।"

॥ ৬ ॥

যারা সভ্য কলকাতায় বাস করে, কাজের লোকের বাড়ি বলতে তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বস্তির কোনও কোণে থাকা, ছেঁড়া ত্রিপলের তালিমারা একটা দুর্বল, নোংরা, দুর্গন্ধময় ঝুপড়িপট্টির ছবি। কিন্তু পূর্ণিমার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে এ ধারণা ভাঙতে বাধ্য।

একতলা বাড়িটা পুরনো, রংচটা ঠিকই, কিন্তু বাইরে থেকেই তার ভিতরের পরিচ্ছন্নতাটা টের পাওয়া যায়। শান্ত পাড়ায় অবস্থিত বাড়ির সামনে থাকা ক'টা গাঁদা, জবা, জুঁইয়ের গাছ স্নিগ্ধতার মাত্রা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কড়া নাড়ার আওয়াজে একটা কালো, বেঁটেখাটো চেহারার মহিলা দরজা খুলে দিল। বছরতিরিশের মেয়েটার গোলগাল মুখে ঘাম জমে আছে। পুলিশ দেখে মেয়েটা কাঠ-কাঠ হয়ে গেল।

ঋজু জিজ্ঞেস করল, "আপনিই পূর্ণিমাদেবী?"

মেয়েটি দম দেওয়া কাঠপুতুলের মতো ঘাড় নাড়ে।

ঋজু বলল, "ভিতরে চলুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

সাদামাটা ঘরটার একপাশে কয়েকটি চেয়ার। তারই দুটোতে বসল ঋজু আর প্রবর। মুখোমুখি একটা চেয়ার নিয়ে বসল পূর্ণিমা। এখনও সে বেশ আড়ষ্ট।

প্রবর হেসে বলল, "আপনার স্বামী বাড়ি নেই?"

পূর্ণিমা নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

প্রবর হাসিমুখেই বলল, "পূর্ণিমাদেবী, আপনি যদি দয়া করে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তা হলে আমাদের খুব সুবিধে হয়, সঙ্গে লেডি পুলিশ নেই যখন, বুঝতেই পারছেন আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি।"

পূর্ণিমা চুপচাপ বসে রইল।

ঋজু কড়া স্বরে বলল, "ও যা জিজ্ঞেস করছে তার উত্তর দিন। মনে রাখবেন আপনার বানানো সুপ খেয়েই কিন্তু ছবিদেবী মারা গিয়েছেন।"

প্রবর ভেবেছিল এবার হয়তো পূর্ণিমা কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু ওর মধ্যে সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মাথা নিচু করে নিচু স্বরে বলল, "জিজ্ঞেস করুন।"

প্রবর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

"আপনি ও বাড়িতে কতদিন কাজ করছেন?"

"তিন বছর।"

"ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কীভাবে?"

"ওদের উলটো দিকের বাড়ি 'চৌধুরী ম্যানসন'-এ আমার বোন রজনী কাজ করে। ওরা প্রথমে ওকেই রান্না করতে বলেছিল। ওর সময় নেই বলে ও কাজটা আমাকে দিয়ে দেয়।"

"তোমার বর কী কাজ করে?" প্রবর সরাসরি 'তুমি'তে নেমে আসে।

"উত্তরপাড়া জুটমিলে জনের কাজ করে।"

"তোমার কত বছর বিয়ে হয়েছে?"

"দশ বছর।"

"তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?"

"গোবরডাঙায়।"

"ক'টা বাচ্চা তোমার?"

"দুটো মেয়ে, একটা ছেলে। মেয়েরা ইশকুলে পড়ে। একটার বয়স আট, আর-একটার ছয়। ছেলের বয়স পাঁচ বছর। ওকে সামনের বার ইশকুলে ভর্তি করে দেব।"

"তুমি কী জান, পি এম রিপোর্ট অনুযায়ী ছবিদেবীর মৃত্যু বিষক্রিয়ায় হয়েছে?"

পূর্ণিমা নিরুত্তর।

"তোমাকে কে সুপ বানাতে বলেছিল?"

"নার্সদিদি।"

"কীসের সুপ বানিয়েছিলে?"

"আনাজের।"

"কী-কী দিয়েছিলে সুপে?"

(ক্রমশ)

ছবি: প্রীতম দাশ

মজার ঝাঁপি

টিনটিন যখন কলকাতায়

কলকাতার বাসিন্দা অরিন্দম ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী বর্ণালি সেনশর্মা ঘোষ বেড়াতে গিয়েছিলেন বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌সে। সেই ব্রাসেল্‌স, যেখানে বসে একের পর-এক টিনটিন কমিক্‌স তৈরি করে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন বেলজিয়ান কার্টুনিস্ট অ্যার্জে। "সেখানকার সুদৃশ্য 'টিনটিন জাদুঘর' দেখেই পরিকল্পনাটা মাথায় আসে," বলছিলেন ঘোষ-দম্পতি। কী সেই পরিকল্পনা?

ইচ্ছে ছিল কলকাতার বুকে এমন একটা রেস্তরাঁ খোলার, যার সাজসজ্জা জুড়ে থাকবে টিনটিন। আর সঙ্গে থাকবে জিভে জল আনা বেলজিয়ান খাবারের সম্ভার, যা পাওয়া যায় না কলকাতার পাশাপাশি আমাদের দেশের অন্য কোনও রেস্তরাঁতেই। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। দেখতে-দেখতেই ঘোষ দম্পতি খুলে ফেলেছেন টিনটিন থিমের রেস্তরাঁ, 'টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেল্‌স ক্লাব'।

কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কের এই রেস্তরাঁয় ঢুকতে গেলেই চোখে পড়বে প্রবেশপথের দু'পাশে দু'রকম ছবি। একদিকের

সমস্তটা জুড়ে টিনটিন, অন্য দিকে সুস্বাদু সব বেলজিয়ান ডিশ। রেস্তরাঁয় বসার জায়গাকেও ভাগ করা হয়েছে দুটো ঘরে, যার একটা 'টিনটিন রুম'। অন্যটা 'ক্যাপ্টেন হ্যাডক রুম'। এককোণে রাখা টিভিতে সারাক্ষণ চলছে টিনটিনের অ্যানিমেটেড কার্টুন, খেতে-খেতে যা দেখতে পারবে ছোটরা। রেস্তরাঁর রান্নাবান্না দেখভালের দায়িত্বে আছেন বৃন্দা চট্টোপাধ্যায় মান্না।

সারা রেস্তরাঁ জুড়েই শোভা পাচ্ছে টিনটিনের বিভিন্ন কমিক্‌সের নানা দৃশ্য। ছোটদের জন্য বিশেষভাবে এখানে রাখা আছে টিনটিনের বিভিন্ন কমিক্‌স, যা তারা পড়তে পারে। সময় কাটানোর জন্য আছে বোর্ড গেমস। আছে ফিশ স্পা-র ব্যবস্থাও! একটা ঘেরা জায়গায় রাখা আছে জ্যান্ত কাঁকড়া, যার মধ্য থেকে অতিথির পছন্দ অনুযায়ী কাঁকড়া বেছে নিয়ে রান্না করে দেবেন রেস্তরাঁর শেফ।

সমস্তটা দেখেশুনে বলাই যায়, ছোটদের পাশাপাশি টিনটিন ভালবাসেন, এমন অভিভাবকদের জন্যও সময় কাটানো এবং পেট পুরে খাওয়াদাওয়ার জন্য আদর্শ স্থান হয়ে উঠতে কসুর রাখছে না এই রেস্তরাঁ।

যা হয়েছে

মশা, নাকি মাছি?

চিনের এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, তিনি খোঁজ পেয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মশার, যার ছড়ানো ডানার দৈর্ঘ্য চার ইঞ্চিরও বেশি। যদিও পরে বইটই ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, ওরকম একটা পতঙ্গের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাকে মশা না বলে মাছি (ক্রেন ফ্লাই) বলাই ভাল। এ-বেচারা অন্য প্রাণীর রক্তও খায় না, ফলে খামোকা একে 'মশা' বলে দেগে দিলে অন্যায়ই হবে।

ক্ষুদ্রতম স্থলজ ফার্ন

দৈর্ঘ্যে মাত্র এক সেন্টিমিটার। হয়তো বা সেকারণেই এতদিন ধরে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পেরেছিল এই ফার্ন (একরকমের গাছ)। সম্প্রতি গুজরাতের জঙ্গলে গবেষকরা খুঁজে বের করেছেন এই ফার্নকে, যা মানুষের হাতের আঙুলের নখের মতোই ছোট্ট। বিশ্বে এর চেয়েও ছোট স্থলজ ফার্ন এখনও অবধি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া না যাওয়ায় এর কপালেই জুটেছে ক্ষুদ্রতম স্থলজ ফার্নের খেতাব। এই লেখার সঙ্গে দেওয়া ফার্নের ফোটোটা খেয়াল করলে কি? দেখে সাপের চেরা জিভের কথা মনে পড়ে যায় না?

ভিনগ্রহে প্রাণের খোঁজ

এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা (যার পুরো নাম 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন') মহাকাশে পাঠাল একটি বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহকে, যার নাম ট্রানজিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট (সংক্ষেপে টি ই এস এস বা টেস)। এতদিন নাসা ভিনগ্রহের খোঁজ চালাত কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে। কিন্তু ইদানীং ফুরিয়ে এসেছে তার জ্বালানি। যে-কারণে কাজে পাঠানো হয়েছে টেস-কে। আপাতত দু'মাস সে নিজের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করবে। তারপর দু'বছর ধরে কড়া নজর রাখবে মহাকাশে, খোঁজ করবে ভিনগ্রহে প্রাণের উপস্থিতির।

গোয়ার নামে ব্যাঙের নাম

গোয়ায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ব্যাঙের এক নয়া প্রজাতিকে। মূলত স্থলে থাকতেই সে স্বচ্ছন্দ হলেও অন্তত জলাশয়ের আশপাশে না থাকতে পেলে মন ভরে না এই ব্যাঙের। গোয়াতেই যেহেতু একে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তাই নাম রাখা হয়েছে গোয়ার প্রাচীন ঐতিহাসিক নামে, 'ফেজারভারইয়া গোয়েমচি'। গোয়ার জলে-জঙ্গলে নানা রকম ব্যাঙের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সেই তালিকা লম্বা হল আরও।

যা হবে

ধুংরি মেলা

হিমাচল প্রদেশের মানালিতে ধুংরি মেলার আসর বসে প্রত্যেক বছর মে মাসের ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে। মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীমের স্ত্রী ছিলেন হিড়িম্বা। মানালিতে এই হিড়িম্বাদেবীরই একটি মন্দির আছে। যে মন্দিরটিকে ঘিরেই প্রতি বছর এই উৎসবের আসর বসে। আশপাশের গ্রাম থেকে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে হিড়িম্বাদেবীর মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। মাঠ জুড়ে মেলা বসে। মানালির নিজস্ব সংস্কৃতির একঝলক সাড়ম্বরে ফুটে ওঠে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে।

বিশ্ব মাতৃদিবস

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার (এবছর ১৩ মে) পালিত হয় মাতৃদিবস। মার্কিন মুলুকের অ্যানা জারভিস ১৯০৮ সালে প্রথমবার মাতৃদিবস পালন করার ব্যবস্থা করেন। যদিও অ্যানা মাতৃদিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন একান্তই নিজের স্বর্গত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল মাতৃদিবস পালন ধীরে-ধীরে ব্যবসায়িক রূপ নিল। কার্ড কোম্পানিরা মাদার্স ডে-র কার্ড তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করল হইহই করে। বিক্রি হতে শুরু করল বর্ণাঢ্য সব উপহার। বিরক্ত অ্যানা একসময় যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন!

ভারত-চিন-পাকিস্তান একসঙ্গে

আতঙ্কবাদ বিরোধী এক সামরিক অনুশীলনে এই প্রথমবার একসঙ্গে অংশ নিতে চলেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তান। সঙ্গে থাকবে চিনের মতো অন্যান্য বেশ কিছু দেশও। আর এই পুরো ব্যাপারটা হতে চলেছে রাশিয়ার বুকে। আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এই ক'টি রাষ্ট্র হাতে হাত মিলিয়ে যে কোনও রকম আতঙ্কবাদের মোকাবিলার জন্য নিজেদের তৈরি রাখতে চায় বলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এর আগেও একসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষা মিশনে একত্রিত হয়েছে। তবে এর আগে কোনওদিন এই দু'টি দেশ একসঙ্গে কোনও সামরিক অনুশীলনে যোগ দেয়নি।

খুদে প্রতিভা

বাপরে বাপ, কী গরমই পড়েছে এখন। ছাতা ছাড়া বাইরে বেরনোই যায় না। এই গরমে একেবারে নতুন ধরনের একটা মজাদার ছাতার ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

আরাত্রিকা সাহা
ষষ্ঠ শ্রেণি, আদিত্য আকাদেমি, বারাসত।

দ্বিতীয়

সম্পূর্ণা নন্দী
সপ্তম শ্রেণি, আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি।

তৃতীয়

সৌম্যব্রত মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল।

চতুর্থ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, মাজিনান নব বিদ্যালয়, গুড়াপ, হুগলি।

পঞ্চম

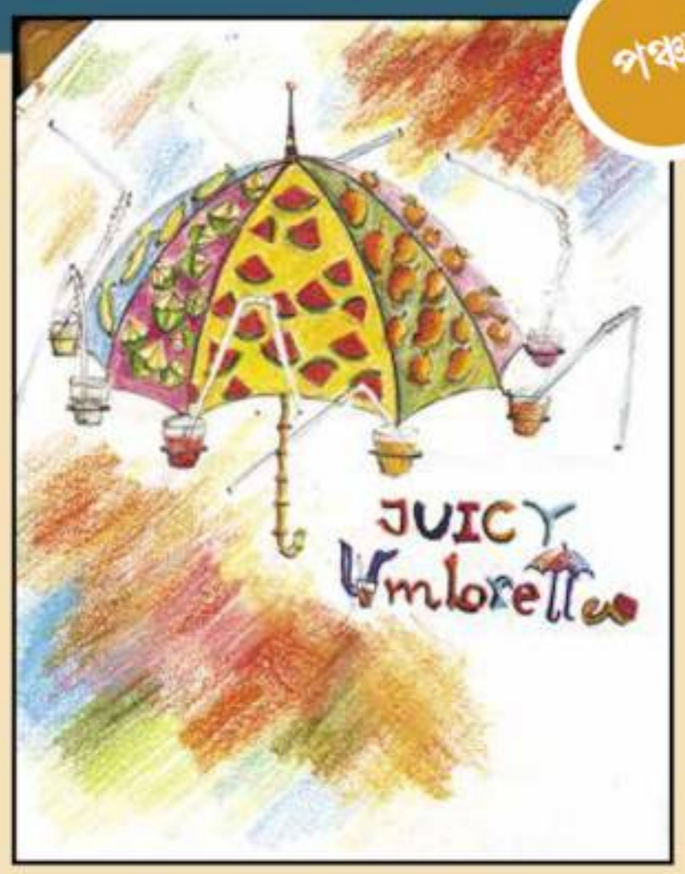

সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, নদিয়া।

এবারের প্রতিযোগিতা

গরমের দুপুরগুলো কীরকম যেন খাঁ খাঁ করে। রাস্তায় একটাও লোক নেই। বাড়ির সকলে ঘুমোচ্ছে। তুমি একা জেগে। এমন সময় একটা কাণ্ড হল। কী সেটা? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, তারাই ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও ২৮ মে-র মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও তোমার ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ জুন সংখ্যায় ছাপব। তবে খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, লিখবে অবশ্যই।

ঠি কা না

'খুদে প্রতিভা' 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

আরও যারা ভাল এঁকেছে

পৌলমী বিশ্বাস
সপ্তম শ্রেণি, কাঁচড়াপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

জরিন হায়াত চৌধুরী
সপ্তম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, অ্যান্ড্রুজগঞ্জ, নিউ দিল্লি।

সৃষ্টি পাল
অষ্টম শ্রেণি, শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।

সুমেধা মিত্র
পঞ্চম শ্রেণি, নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগনা।

আর্তি মণ্ডল
অষ্টম শ্রেণি, গুসকরা বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান।

অনন্যা সাধুখাঁ
অষ্টম শ্রেণি, বারাসত গার্লস হাই স্কুল।

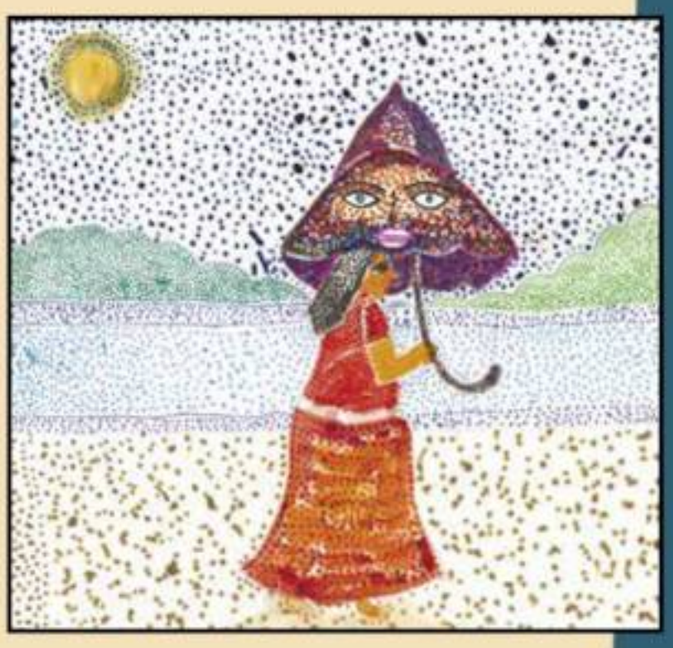

ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)

দীর্ঘ ইতিহাস স্কুল পত্তনের। ভবিষ্যতেও সারা জেলা তথা রাজ্যে উজ্জ্বল নজির গড়ার অঙ্গীকার স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রদের।

ডায়মন্ডহারবার রেলস্টেশন থেকে দেখা যায় ডায়মন্ডহারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠের সুদৃশ্য বিদ্যালয় ভবন। ২০১৬ সাল থেকে এই স্কুলে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান-কলা বিভাগসহ উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স। ছাত্রসংখ্যা হাজার ছুঁইছুঁই। প্রধানশিক্ষকসহ ২৬ জন স্থায়ী পদে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে জেলার শীর্ষস্থানীয়। কীভাবে এই উত্তরণ, তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে অতীত ইতিহাসের পাতায়। যে গল্প শোনা গেল বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক কমলকুমার পাত্রের মুখ থেকে।

কমলকুমার পাত্র

১৯৪৭ সাল। অহিংস-সহিংস আন্দোলনে অশেষ কষ্ট স্বীকার ও বহু জীবন বলিদানের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু স্বাধীনতা এল খণ্ডিত রূপে। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ থেকে সহায়সম্বলহীন হাজার-হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। ডায়মন্ডহারবার রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত শত-শত অসহায় মানুষের সেবায় এগিয়ে এলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর দল। উদ্বাস্তু ত্রাণকেন্দ্র কালক্রমে পরিণত হল স্থায়ী সেবাকেন্দ্রে। ১৯৪৯ সালে সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষ ডায়মন্ডহারবার আশ্রমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

দেহে-মনে-প্রাণে সুস্থসবল ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রসমাজ গড়ে তাদের সৃজনের সারথিরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তাঁরই অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তদানীন্তন যুগ্ম সম্পাদক পূজ্য স্বামী যোগানন্দজির উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে উদ্বাস্তু ছেলেমেয়ে ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাবিস্তারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মহৎ সংকল্প নিয়ে স্বামী যোগানন্দজি ১৯৫৬ সালে ডায়মন্ডহারবার সেবাকেন্দ্রে জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ডায়মন্ডহারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠ ১৯৬৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস খুবই দুঃখের। বিদ্যালয় ভবনের জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ভিক্ষেও করেছেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা। অবশেষে ১৯৭০ সালে স্বামী যোগানন্দজী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ শুরু করেন। প্রথমে মাত্র চারটি ক্লাসরুম পাকা ঘরে স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য কোনও সরকারি অনুদান তখনও পাওয়া যায়নি। ধীরে-ধীরে সহৃদয় জনগণের দানেই বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। এবিষয়ে সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক

তথা ডায়মন্ডহারবার আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ছাত্রদের খেলাধুলোর মাঠের সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ১৯৭২-৭৩ সালে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠ লিজ় নেওয়া হয়েছে।

সঙ্ঘের শীর্ষস্থানীয় স্বামী বেদানন্দজি, স্বামী আত্মানন্দজি, স্বামী প্রজ্ঞানন্দজি, স্বামী নির্মলানন্দজি, স্বামী বিশ্বানন্দজি, স্বামী অশোকানন্দজি প্রমুখ বহু সন্ন্যাসী বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন। একইভাবে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব প্রধান শিক্ষকের আসন অলংকৃত করে বিদ্যালয়কে এক অনন্য মাত্রা দেওয়ায় সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে স্বাধিকার ভোগের অধিকারী। ২০০৪ সাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কামদেব শাসমল বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় থেকে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক পদে বর্তমানে আসীন আছেন স্বামী ত্যাগব্রতানন্দজি এবং সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করছেন স্বামী দর্শনানন্দজি। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি ও স্বামী দিব্যানন্দজি।

অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির পাশাপাশি আলাদা করে কম্পিউটার ল্যাবও শোভা বাড়িয়েছে বিদ্যালয়ের। ২০১৫ সালে এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১১৪ জন। সকলেই পাশ করে এবং সেবছর ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পায় একজন ছাত্র। সর্বোচ্চ নম্বর ছিল শুভম পালের (৬৪৬)। ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১১৭। সকলেই উত্তীর্ণ হয়। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পায় তিনজন। সর্বোচ্চ নম্বর ছিল দ্বৈপায়ন বৈদ্যের (৬৪৪)। ২০১৭-য় মোট ৯৭ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হয়। নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পায় চারজন। সর্বোচ্চ নম্বর ছিল মহম্মদ আফতাবউদ্দিন মোল্লার (৬৪২)।

এবছর, অর্থাৎ ২০১৮-য় প্রথমবার এই বিদ্যালয় থেকে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে মোট ৩২ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক কমলকুমার পাত্র প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দক্ষ হাতে সামলাচ্ছেন ২০১৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে। তাঁর আশা, স্কুলের সুনাম ও ধারাবাহিক ভাল ফলের ঐতিহ্য বজায় রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের গৌরব আরও বাড়িয়ে তুলবে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলো এবং অন্যান্য গতিবিধিতেও বিদ্যালয়ের সুনাম আছে। এই বছরই দশম শ্রেণির ছাত্র রণিত ভাণ্ডারী ডাক পেয়েছে মোহনবাগান জুনিয়র দলে। ২০১৬ সালে ইংলিশ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড স্কিল টেস্টে রাজ্য স্তরে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল অরিত্র মণ্ডল। আগামী দিনেও সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দৃঢ় হস্তের পরিচালনা এবং শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিদ্যালয় যে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, তা বোঝা যায় বছর-বছর এই স্কুলে ভর্তি হতে চাওয়া ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকায়।

অচ্যুত দাস

হলি রক স্কুল, বর্ধমান

পুঁথিগত বিদ্যার সীমানা ছাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানবিক গুণের প্রসার ঘটাতে চায় বর্ধমানের নবীন স্কুলটি।

বর্ধমানের হলি রক স্কুলের বয়স খুব বেশি নয়। তবে এরই মধ্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র ধারা ও মতাদর্শ স্থাপন করতে পেরেছে এই স্কুল। বর্ধমানে প্রথম বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন শান্তিকুমার ও অপরাজিতা সাক্সেনা। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮২ সালের ২০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হলি রক। তার ঠিক আগেই কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলার উপর এঁরা শপথ নিয়েছিলেন সমাজের প্রতি অকুণ্ঠ সেবার। সেই কথা মাথায় রেখে স্কুলের নাম রাখা হয় হলি রক। প্রথমে শাঁখারিপুকুরে মুরারি খাসনবিশের ভাড়াবাড়িতে স্কুলটি শুরু হলেও ১৯৯৮ সালে বিখ্যাত ১০৮ শিবমন্দিরের কাছে তৈরি হয় স্কুলের নিজস্ব ভবন। এক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন শান্তিবাবু। তবে যে চারাগাছ রোপণ করেছিলেন, বর্তমানে সেই চারাগাছ লালনের দায়িত্ব তাঁর সহধর্মিণী অপরাজিতা সাক্সেনার হাতে। তিনি অবশ্য একা নন। স্কুলের হাল ধরতে ঠাকুরমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন পৌত্র ডিরেক্টর স্বর্ণাভ সাক্সেনা। আছেন পুত্র অনিরুদ্ধ সাক্সেনা এবং পুত্রবধূ তাপসী সাক্সেনাও। এছাড়াও যাঁদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবন্ধু, অসংখ্য অভিভাবক এবং সর্বোপরি প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা। বর্ধমানের বুকে এমন একটি অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী এবং একই সঙ্গে আধুনিক স্কুল তৈরি করতে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন সাক্সেনা দম্পতি। সেজন্য মানুষ তাঁদের সম্মান জানাতে ভোলেনি। এই স্কুলের অধ্যক্ষা অপরাজিতা সাক্সেনা 'দ্য টেলিগ্রাফ লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছেন। লায়নস ক্লাবও তাঁর কাজের জন্য 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' দিয়েছে। এই স্কুলের প্রায় সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাই কাউন্সিল ট্রেন্ড এবং এঁদের অনেকেই বোর্ডের নিয়মিত পরীক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এই স্কুলে ২২টি শ্রেণিকক্ষ আছে। আছে নিজস্ব খেলার মাঠ, বাস্কেটবল কোর্ট এবং শিশুদের জন্য একটি সুন্দর পার্ক। বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রশস্ত হলঘরও আছে। সেই সঙ্গে স্কুলে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য ই-ক্লাসরুমেরও ব্যবস্থা আছে, সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রযুক্তির সাহায্যে বিষয়বস্তু প্রাঞ্জলভাবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা আছে স্কুল কর্তৃপক্ষের। তার মধ্যে কিছু-কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরুও হয়েছে। বর্তমানে হলি রক স্কুলে মোট ৪৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১৫জন শিক্ষাবন্ধু। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১।

দীর্ঘ ৩৬ বছরের যাত্রাপথে হলি রক স্কুলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছে, যারা শুধু পশ্চিমবঙ্গে কিংবা ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। প্রচলিত ধারায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আইনজীবী-শিক্ষক-ব্যবসায়ী ছাড়াও নানা

রকম অপ্রচলিত ক্ষেত্রে যেমন সিনেমা পরিচালনা, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা এবং সৃজনশীল কাজেও এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব গর্ব করার মতো। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১০০। আই সি এস সি বোর্ডের অধীনে এটি একটি কো-এডুকেশন স্কুল। প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান তিনটি শাখাতেই পাঠদান হয়। ২০১৭ সালে আই সি এস ই-তে ৮৭জন এবং আই এস সি-তে ৭৮জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। সাফল্যের হার দু' ক্ষেত্রেই শতকরা একশো ভাগ। ২০১৭-১৮ তে আই সি এস ই এবং আই এস সি-তে প্রথম হয়েছিল যথাক্রমে সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী এবং অঙ্কিতা কর্মকার। কয়েক বছর আগে আই সি এস ই-তে এই স্কুলের ছাত্র অভিষেক নাগ জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিল।

এছাড়া কাউন্সিল আয়োজিত নানান প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার অর্জন করে থাকে। প্রতি বছর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নেচার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্প্রতি একটি কৃতিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তারা মুম্বইয়ে একটি কুইজ় প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের জীবন গড়ার একটি প্রধান অবলম্বন হল খেলাধুলো, যা একইসঙ্গে ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার অবিচ্ছেদ্য পরিপূরকও বটে। জাতীয় স্তরের বিভিন্ন খেলাতেও এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সফল। জেলা অ্যাথলেটিকস মিট-এ অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হয়েছে বিজয়কুমার প্রসাদ, প্রমিতা মণ্ডল, জ্যোতি রাউত (অনূর্ধ্ব ১৯, মেয়েদের বিভাগে ইন্ডিয়া ক্যাম্পে নির্বাচিত), বিদিশা মণ্ডল, বিশাখা গুপ্ত, কর্ণবীর দে, সাগরপ্রসাদ এবং অংশুকুমার ওঝা। জেলাস্তরে ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছে কর্ণবীর দে এবং শিবগুণ জাগ্নি। ফুটবলে স্কুলের সুরজিৎ হাঁসদা খুবই প্রতিশ্রুতিমান। সে মোহনবাগান জুনিয়র আকাদেমি, কলকাতা লিগে নির্বাচিত হয়েছে। স্কুলের দক্ষ প্রশিক্ষকরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষকরাও এই স্কুলে আসেন ছাত্রদের ট্রেনিং দিতে। কিছুদিন আগেই এসেছিলেন বাস্কেট বলের কোচ নাতালি আন্দ্রে। ইনি একজন পর্তুগিজ় নাগরিক এবং এন বি এ (ভি এস এ) বাস্কেটবল কোচ।

শেষে বলা যায়, হলি রক স্কুলের কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, যে কারণে এটি অন্য স্কুলের চেয়ে আলাদা। প্রথম থেকেই পুঁথিগত বিদ্যাপ্রদানে স্কুলটি মনোযোগী থাকেনি। পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং মানবিকতার শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছে সে। তার ফলে এক অনবদ্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের নজির রাখতে পেরেছে এই স্কুল। উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেও এখনকার ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রথম শিক্ষাঙ্গনকে ভুলে যায় না। যখনই তারা বর্ধমানে আসে, তখন একবার অবশ্যই তাদের প্রিয় ম্যামের সঙ্গে দেখা করে যায়, তাঁকে প্রণাম করতে আসে। মনে করে দেখা করে যায় পুরনো শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাবন্ধুদের সঙ্গেও। এই শ্রদ্ধাশীল মনোভাবই হলি রক স্কুলকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এখানে শুধু ভবিষ্যতের বড়-বড় বিদ্বান নির্মাণ করা হয় না। প্রকৃত মহৎ মানুষ তৈরির দিকেই এখানকার শিক্ষক-শিক্ষাবন্ধুদের লক্ষ্য।

সবশেষে অধ্যক্ষা শ্রীমতী অপরাজিতা সাক্সেনা জানালেন কিছু প্রয়োজনীয় কথা। "বর্তমানের এই সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবিত জীবনে ছোটরা বই পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যার ফলে তাদের কল্পনার বিস্তার এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বাচ্চারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই তারা যাতে দক্ষ, সফল এবং মানবিক গুণসম্পন্ন হয় তার জন্য আমাদের প্রত্যেককে যত্নবান হতে হবে।" তিনি চান তাঁদের স্বপ্নের স্কুল হলি রক সমাজে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী থাকবে চিরকাল। এই কাজে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে হলি রক-এর পাশে থাকে, স্বপ্নকে সাকার করতে হাত বাড়ায়, এটাই তাঁদের একান্ত ইচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শব্দসন্ধান

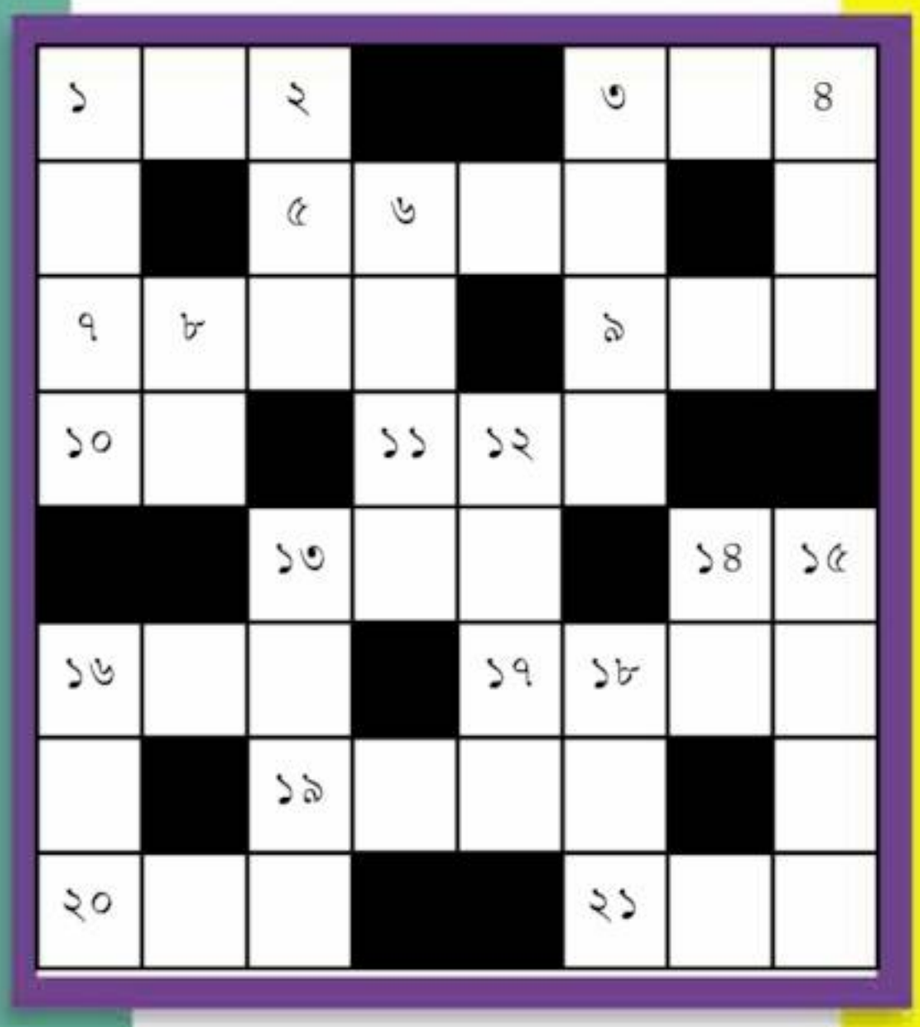

পা শা পা শি

১। হিন্দিভাষায় ‘বোঝা’ বোঝায়।
৩। দুর্গা।
৫। হাততালি।
৭। আওয়াজ।
৯। কড়ি___ । পুরনো বাড়ির সিলিংয়ে থাকত।
১০। থাকা।
১১। পাইন গাছের আঠা।
১৩। স্নান করতে গেলে এটি লাগবেই।
১৪। শেষে ‘ন’ যোগ করলেই গল্প, গাথা বোঝায়।
১৬। মিষ্টি ফল। রংটা ধূসর।
১৭। এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত ___ ...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯। ডাল, ভাতের সঙ্গে এটি হলে আর জবাব নেই।
২০। শুঁড়তোলা জুতো।
২১। রত্ন। মণি।

উ প র - নী চ

১। বর্ধমানের গ্রাম।
২। এই সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে মস্ত মেলা বসে।
৩। পাহাড়ি রুক্ষ অঞ্চলে এই গাছের জঙ্গল খুব দেখা যায়।
৪। পুলিশের বড় কর্তা।
৬। জাঁকজমক।
৮। গানের গতি।
১২। বহু মানুষের সমাবেশ।
১৩। সহজ-সরল।
১৪। বাবার ভাইকে যা বলা হয়।
১৫। তাসের একটি বিভাগ।
১৬। সব।
১৮। অনেক দোকান একসঙ্গে যেখানে থাকে।

গত সংখ্যার সমাধান

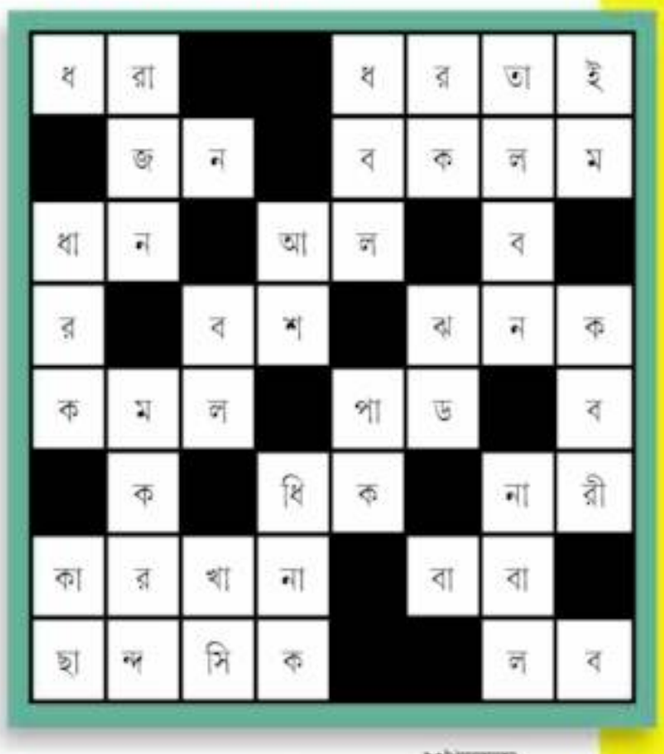

শালুক

নিজের হাতে

কাগজের প্লেট দিয়ে মাছ বানাও সহজে

উপকরণ: একটা গোলাকার কাগজের প্লেট, রঙিন আর্ট পেপার, কাঁচি, আঠা।

কীভাবে করবে: ১। ছবি অনুযায়ী গোলাকার কাগজের প্লেট থেকে একটি ত্রিকোণ অংশ কেটে নাও। কাগজের প্লেটটি ঠিক হাঁ করা মাছের মুখের মতো দেখাবে।
২। মাছের লেজ ও পাখনা তৈরি করতে রঙিন আর্টপেপারের সাহায্য লাগবে। ড্রয়িং করে অংশগুলো কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কেটে নাও।
৩। শেষে ছবি অনুযায়ী এগুলি প্লেটের গায়ে আঠা দিয়ে আটকে দিলেই মাছের শরীর তৈরি হয়ে যাবে। এবার আর্ট পেপার থেকে একটা ছোট্ট গোল অংশ কেটে নিয়ে প্লেটের গায়ে আটকে দিলেই মাছের চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠবে।
৪। এভাবে কিছু নানা রঙের মাছ তৈরি করে কোনও উঁচু জায়গা থেকে ঝুলিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে বেশ অন্যরকম একটা ডেকরেশন হয়ে যাবে। যে দেখবে, সে-ই কত প্রশংসা করবে!

গুরুপ্রসাদ দে

আনন্দমেলা

টিনটিন নিয়ে কুইজ়

নীচের সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও চটপট। সেরা উত্তরদাতাদের জন্য আছে দারুণ সুযোগ।

১৫ জনের মাথায় উঠবে বিজয়ীর মুকুট।

১। টিনটিনের বিজ্ঞানী বন্ধুর নাম বলো।

২। টিনটিনের গল্পে বারবার আসেন যে বিখ্যাত গায়িকা, তাঁর নামটি বলো।

৩। টিনটিনের বইতে কারা কালো টুপি ও ছড়ি ব্যবহার করে?

৪। টিনটিন কেন তোমার প্রিয়? (কুড়ি শব্দের মধ্যে)

নিয়মাবলী

অংশগ্রহণকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী হওয়া বাধ্যতামূলক। এই প্রশ্নপত্রটি পূর্ণ করে দু'ভাবে তোমরা আমাদের কাছে পাঠাতে পার। এক নম্বর, তোমরা এটি পূর্ণ করে আনন্দমেলার দফতরে পাঠিয়ে দাও পত্রিকার ঠিকানায়। ঠিকানা: টিনটিন নিয়ে কুইজ়, আনন্দমেলা, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১। দু' নম্বর, পাতাটি লিখে ভর্তি করে সেটার একটা পরিষ্কার ফোটো তুলে anandamelamagazine@gmail.com-এই মেল আইডিতে মেল করে দাও। মনে রেখো, পাঠানোর শেষ তারিখ কিন্তু ১৮ মে।

লক্ষ্যে স্থির নীরজ

নীরজের লক্ষ্যভেদ

জ্যাভলিনে ভারত পেয়ে গিয়েছে এক নতুন তারকাকে। নীরজ চোপড়ার গল্প শোনাচ্ছেন **সায়ক বসু**

হরিয়ানার আর পাঁচটি মধ্যবিত্ত পরিবার যেমন হয়, তাঁর পরিবারও তেমন ছিল। খান্ডরায় অবস্থিত ওই ছোট্ট বাড়িটিতে ছিল ১৬ জন সদস্য। মূলত চাষই ছিল জীবিকা। ফলে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে পরিবারের স্বপ্ন থাকলেও, সেটি ছিল 'সাধারণ'। মাঝারি একটা চাকরি করে পরিবারকে দেখবে, এমনটা আর কী। ছেলেটি ছিল ভীষণ দুষ্টু। ঢিল মেরে মৌচাক ভাঙা, প্রতিবেশীর বাগানের আম চুরি, বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে সাঁতার... সব করত। তার জ্বালায় তিতিবিরক্ত প্রতিবেশী বাড়িতে নালিশও করতে এসেছে অনেকবার। আসলে ঠাকুরমাই তো ছোট্ট নীরজের মাথাটা খেলেন! এমন আদর দিতেন যে, নীরজ একেবারে 'বাঁদর' হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া অত ভাল খাবার! ঠাকুরমার হাতের ঘি চিনি মাখানো রুটি, মালাই, চুর্মা ছাড়া যায় নাকি? ব্যস, যা হওয়ার তাই হল। ওজন বেড়ে গেল অনেকটা। শেষে বাড়ির বড়রা জোর করে নীরজকে ভর্তি করে দিলেন জিমে। পানিপথে অবস্থিত জিমে প্রতিদিনই হাজিরা দিত নীরজ। কিন্তু কে জানত, এই জিমেই জীবনের মোড় বদলে যাবে তার!

২০১০ সাল তখন। জিমের পাশে শিবাজি স্টেডিয়ামে জগিং করছিলেন নীরজ। হঠাৎ জ্যাভলিন থ্রোয়ার জয় চৌধুরীর নজরে পড়েন তিনি। কী যে খেয়াল হল জয়ের... নীরজকে ডেকে, ছুড়তে বললেন জ্যাভলিন। তখনই বোঝা যায়, জ্যাভলিন থ্রোয়িংয়ে সহজাত দক্ষতা আছে নীরজের। কারণ প্রথম থ্রোয়েই জ্যাভলিনটা ৩০-৪০ মিটার চলে গিয়েছিল! জ্যাভলিনে মন মজল নীরজের। কিন্তু জিনিসপত্র কেনা হবে কী করে? একটা আন্তর্জাতিক মানের বল্লমের দাম এক লক্ষ টাকারও বেশি। সাধারণগুলো ১৫-২০ হাজারে মেলে। কিন্তু জুতোর দামই যে ১০ হাজার! ভারী চিন্তায় পড়েছিলেন নীরজ। কিন্তু একজন সাধারণ ছেলের অসাধারণ হয়ে ওঠার পিছনে পরিবারের যে কত বড় ভূমিকা থাকে, তা নিশ্চয়ই তোমরা জান। হলও তাই। নীরজের পরিবার বাড়ি মেরামতির টাকা বাঁচিয়ে নীরজকে কিনে দিল জ্যাভলিন। ২০১১ সালে জয়ের সঙ্গে পঞ্চকুলায় গিয়ে ট্রেনিং শুরু করেন নীরজ। শুরু থেকেই নজর কেড়ে নিচ্ছিলেন তিনি। আর পোল্যান্ডে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সবাইকে চমকে দেন! ৮৬.৪৮ মিটারের থ্রোয়ে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হয় তাঁর হাত ধরে, ভেঙে যায় জাতীয় রেকর্ডও। স্বপ্নের দৌড় শুরু করেন নীরজ। এবারের কমনওয়েলথ গেমস-এও তৈরি করেছেন রেকর্ড। কারণ ৮৬.৪৭ মিটারের থ্রোয়ে ভারতকে জ্যাভলিনের প্রথম কমনওয়েলথ সোনা এনে দিয়েছেন নীরজ। হিসেব বলছে, এখনও অবধি এবছর পৃথিবীতে যে ক'জন জ্যাভলিন ছুড়েছেন, নীরজেরটা তার মধ্যে দ্বিতীয়! ২০ বছর বয়সি রাজপুতানা রাইফেলস-এর নায়েব সুবেদারের চোখে এখন অলিম্পিক্সের স্বপ্ন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে ভারত মেডেলের আশা রাখতে পারে একমাত্র নীরজের কাছ থেকেই। নীরজ অবশ্য আকাশকুসুম ভাবেন না। সামনে ইউরোপে ডায়মন্ড লিগ আছে, অগস্টে আছে এশিয়ান গেমস। অলিম্পিক্স-এর আগে ৯০ মিটারের থ্রো নিয়মিতভাবে করতে হবে, জানেন নীরজ। তাঁর 'দাদা' জয়ের অবশ্য বক্তব্য, নীরজ চেষ্টা করলেই ৯৫ মিটার ছোঁবেন! লক্ষ্যভেদ হয় কি না, সেটাই দেখা বাকি।

ভারত আশা করতে পারে নীরজকে নিয়ে

তারার কাছাকাছি সালাহ

মিশরের রাজা মো

মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে লিভারপুলের 'মসিহা'র। সেই মহম্মদ সালাহ-কে চেনাচ্ছেন **ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়**

তিনিই কি পরবর্তী মেসি? বালঁ দ অর কি তিনি পেতে পারেন? তিনিই কি লিভারপুলকে আবার পুরনো সম্মান ফিরিয়ে দেবেন? এমন হাজার প্রশ্ন উঠছে যাঁকে নিয়ে, তিনি 'ইজিপশিয়ান কিং', মহম্মদ (সংক্ষেপে 'মো') সালাহ। স্টিভেন জেরার্ডের মতো কিংবদন্তি তো বলেই দিয়েছেন, সালাহই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়! বিশেষত চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিনি যেভাবে সেমিফাইনালের প্রথম লিগে রোমাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তার পর তো ধন্য-ধন্য পড়ে গিয়েছে! দু'টি গোল করেছেন, দু'টি গোল করিয়েছেন সালাহ। যেভাবে তিনি খেলেছেন, তাতে ফুরিয়ে গিয়েছে উদাহরণ! অথচ এই রোমা-ই সালাহকে লিভারপুলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল মাত্র ৪৭ মিলিয়ন ডলারে! তবে ওই একটি ম্যাচ দেখেই মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনাগুলো হচ্ছে না। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে এই মরসুমে সালাহ এগিয়ে আছেন বাকি সবার চেয়েই। ৪৭টি ম্যাচে তিনি করেছেন ৪৩টি গোল, সঙ্গে ১৩টি অ্যাসিস্ট। ৩৯টি ম্যাচে রোনাল্ডো করেছেন ৪২টি গোল, আটটি অ্যাসিস্ট। আর মেসি, ৫০ ম্যাচে ৪০টি গোল, ১৮টি অ্যাসিস্ট। হয়তো লিভারপুলের ইতিহাসে এক সিজ়নে ক্লাবের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডটিও এবার ভেঙে দেবেন সালাহ। কিন্তু ২০১৭ থেকে ক্লাবের চোখের মণিটির শুরুটা কিন্তু মসৃণ ছিল না।

বছর ১৪ যখন বয়স, তখন স্কুলে টিফিন না খেয়ে রাহাখরচ বের করতেন সালাহ। মিশরে তাঁর গ্রাম নাগরিগ থেকে বাসে করে কায়রো যাতায়াতের খরচ। নাগরিগ আর কায়রোর দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার, যেতে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা স্কুল করে, মাস্টারমশাইয়ের হাতে চিঠি ধরিয়ে ছুটতেন সালাহ। আবার কায়রোয় এল মোকাউলুন ক্লাবে পৌঁছে, ট্রেনিং শেষ করেই ছুটতে হত তাঁকে। ছোট্ট গেঁয়ো ছেলেটির কোনও বন্ধুই হয়নি। খেলতেন তৃতীয় বাছাই লেফ্‌ট ব্যাক হিসেবে! যা-ই হোক, প্রতিভা তো দমিয়ে রাখা যায় না। একদিন সালাহ শুধু ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়ই হয়ে উঠলেন না, ২০১২-র অলিম্পিক্‌সে মিশরের জার্সি গায়ে খেলে ফেললেন তাঁর আদর্শ মহম্মদ আবুত্রিকার পাশেও। তারপরই, সুইস ক্লাব বাসেলের চোখে পড়ে যান তিনি। বহুদিন ধরেই সালাহর উপর নজর রাখছিল তারা। ব্যস, ইউরোপ চলল নাগরিগের রাজা! বাসেল থেকে চেলসি, তারপর রোমা, মাঝে লিয়েনে আরও ক'টি ক্লাব, সালাহ কম ঘোরেননি। কিন্তু লিভারপুলে, বিশেষত কুটিনহো ক্লাব ছাড়ার পর থেকে যে ফর্ম সালাহ দেখাচ্ছেন, তা আগে কখনও দেখাননি। মূলত রাইট উইঙ্গার সালাহর বাঁ পা এখন কথা বলছে। লিভারপুল হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলবে এবছর। ওদিকে তাঁর হাত ধরেই ২০ বছর পর বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মিশর। বিশ্বকাপটা ভাল খেললে বছরটা কিন্তু সত্যিই সালাহর হয়ে যেতে পারে! বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞর মত, মেসি-রোনাল্ডোর জায়গায় পৌঁছতে গেলে আরও দীর্ঘদিন ফর্ম ধরে রাখতে হবে সালাহকে। সে তো অবশ্যই, কিন্তু আপাতত তাঁকে নিয়ে তো স্বপ্ন দেখছে অনেকগুলো চোখ!

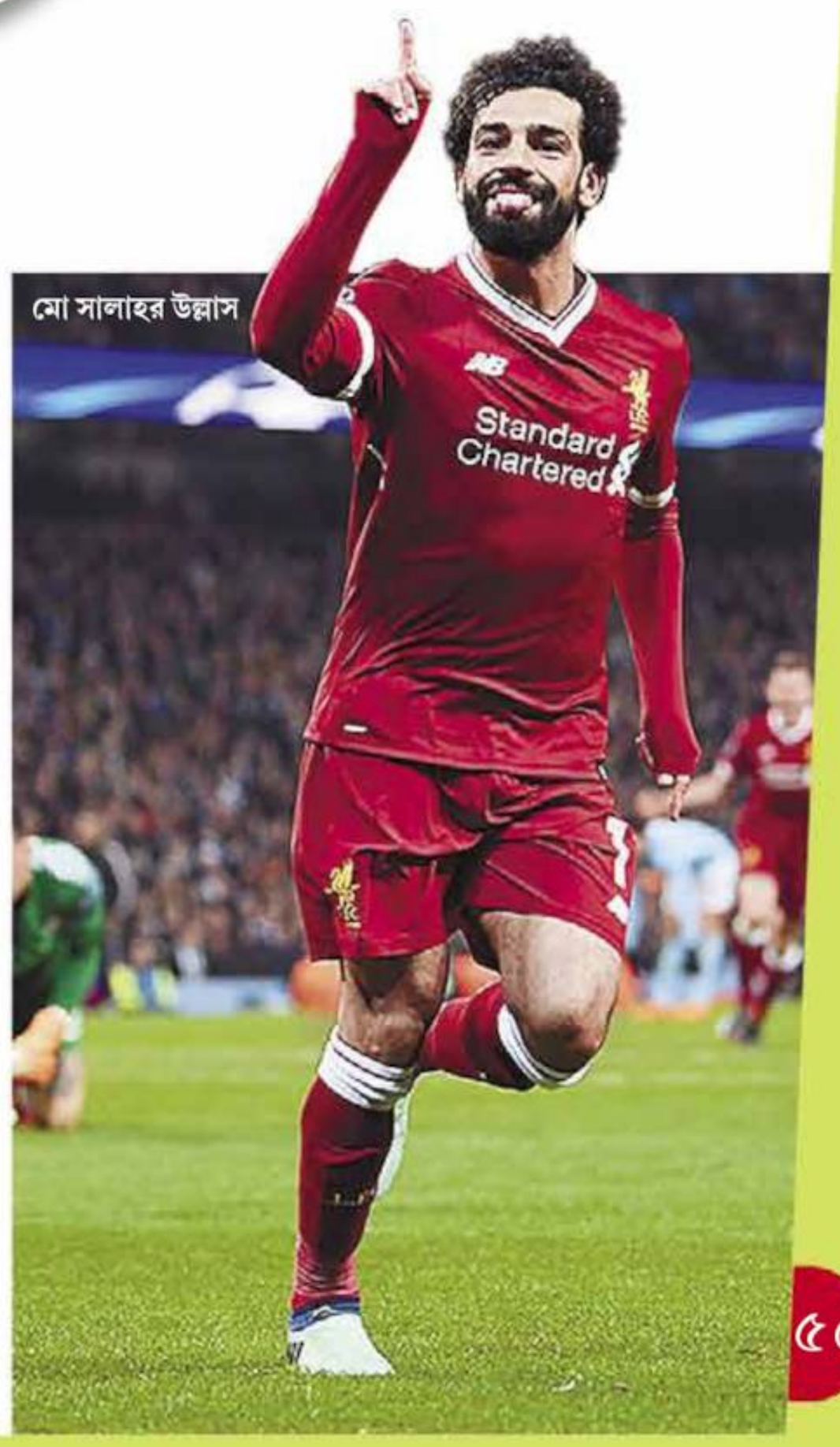

মো সালাহর উল্লাস

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

চানুর চোখে এশিয়াড

সদ্য গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন তিনি। মণিপুরি ভারোত্তোলক সাইখম মীরাবাঈ চানুর চোখে এখন আসন্ন জাকার্তা এশিয়াডে সোনা জয়ের স্বপ্ন। প্রথমে ভেবেছিলেন তিরন্দাজ হবেন। কিন্তু পরে হয়ে উঠলেন ভারোত্তোলক। মণিপুরের বিখ্যাত ভারোত্তোলক কুঞ্জরানি দেবীকে দেখেই এই খেলাকে বেশি করে ভালবেসে ফেলেন চানু। তবে রিও অলিম্পিক্‌সের ব্যর্থতার পর একবার ভেবেছিলেন খেলাটা ছেড়েই দেবেন। সেই চানুই গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব ভারোত্তোলনে সোনা জিতে কর্ণম মলেশ্বরীর দু'দশক আগে গড়া সাফল্য ছুঁয়ে সাড়া ফেলে দেন। গোল্ড কোস্টে ৪৮ কেজি বিভাগে ১৯৬ কেজি তুলে সোনা জিতেছেন। তবে চানু বলেছেন, "এশিয়াডের লড়াইটা বেশ কঠিনই হবে। তাই দুশো কেজি তোলার লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছি অনুশীলন।"

ফেরার লড়াইয়ে জ়কোভিচ

কনুইয়ের চোট সারিয়ে দীর্ঘ সময় পর সার্কিটে ফিরলেও এখনও সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখতে পাননি তিনি। উলটে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকা নোভাক জ়কোভিচকে অনেক সাধারণ মানের খেলোয়াড়ের কাছেও হার মানতে হচ্ছে। খারাপ সময়টা যেন কিছুতেই কাটছে না তাঁর। ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি, মন্টি কার্লোর মতো একের পর-এক টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হতে হচ্ছে তাঁকে। গত বছর উইম্বলডন জয়ের পর থেকেই ১২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক পরবর্তী কোনও প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালেও পৌঁছতে পারেননি! চলতি মরসুমে সপ্তমবার অস্ট্রেলিয়া ওপেন জয়ের লক্ষ্যে কোর্টে নামলেও ব্যর্থ হন। এর পরেই তাঁকে অস্ত্রোপচারে যেতে হয়। ২৭ মে ফরাসি ওপেন শুরু। জোকারের লড়াই এখন নিজের সঙ্গেই।

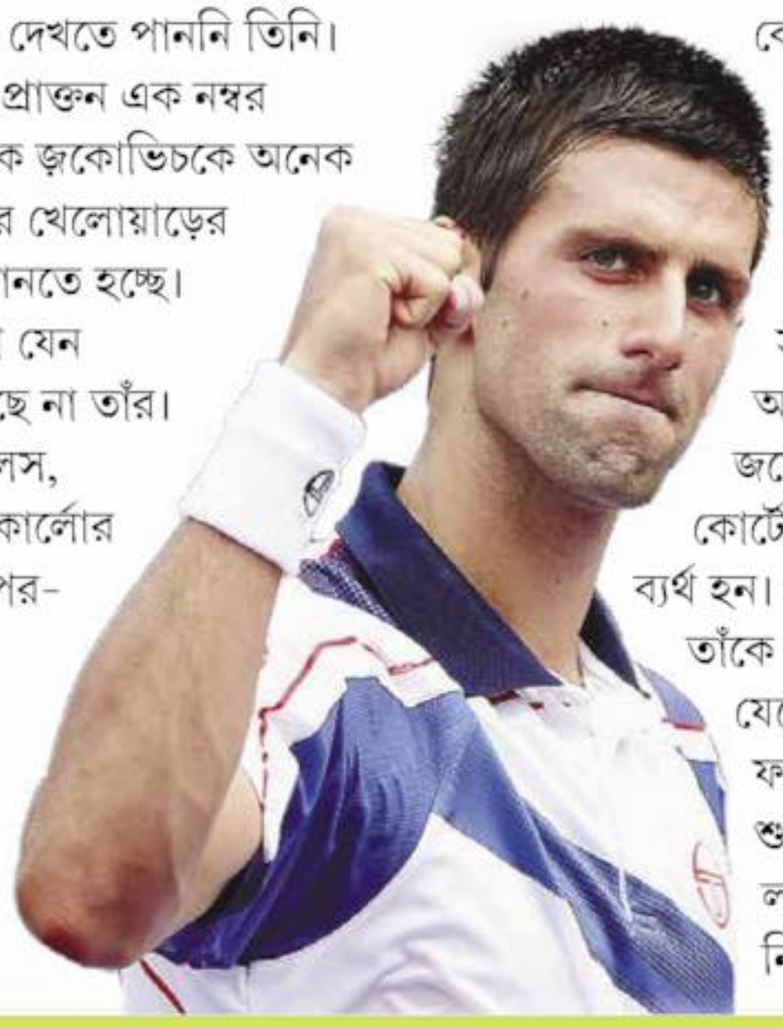

বিতর্কের কেন্দ্রে মারিন

কমনওয়েলথ গেমসে নেমে এবার চরম ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরেছে ভারতীয় হকি দল। ২০০৬ সালের পর এই প্রথম একেবারে শূন্য হাতে ফিরেছেন মনপ্রীত সিংহরা। হকি ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা দলের এই অবস্থাকে একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না। সর্দার সিংহ, রমনদীপ সিংহদের মতো সিনিয়র খেলোয়াড়দের দলের বাইরে রেখে টিম নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন কোচ সোর্দ মারিন। দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সে বিতর্কের আঙুল এখন তাই মারিনের দিকে। অগস্টে এশিয়ান গেমস। এর পর ভুবনেশ্বরে রয়েছে বিশ্বকাপ হকি। এবার মারিনের চাকরি যায় কিনা, সেটাই দেখার।

সোনা জিতলেন স্টার্ক

মিচেল স্টার্ক। এবারের আই পি এল-এর নিলামে ন'কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই অজ়ি পেসারকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু পায়ের চোটের জন্য তিনি এখন রিহ্যাবে। তবে সোনাজয়ী যে স্টার্কের কথা বলছি, তিনি মিচেল স্টার্ক নন। বরং তাঁর ভাই ব্র্যান্ডন স্টার্ক। গোল্ড কোস্টে এবারের কমনওয়েলথ গেমসে যিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে হাইজাম্পে সোনা জিতে সাড়া ফেলেছেন। এই ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়া শেষবার সোনা জিতেছিল আজ থেকে ২৪ বছর আগে, ১৯৯৪ সালে। ব্র্যান্ডনের দাদা মিচেলের স্ত্রী অ্যালিসা হিলিও ক্রিকেটার। প্রাক্তন অজ়ি ক্রিকেটার ইয়ান হিলি আবার অ্যালিসার কাকা। সেদিক দিয়ে দেখলে একেবারেই ক্রিকেট পরিবারের সদস্য ব্র্যান্ডন। ছেলেবেলায় তিনিও দাদা মিচেলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু আজ ২৪ বছরের ব্র্যান্ডনের কাছে ক্রিকেট একেবারেই অপছন্দের একটা খেলা।

অবসর নিলেন ইনিয়েস্তা

দীর্ঘ ২২ বছর বার্সেলোনার জার্সি গায়ে মাঝমাঠে জাদু দেখিয়েছেন আন্দ্রে ইনিয়েস্তা। ২০১০ সালে স্পেনের জার্সি গায়ে তিনি যখন দেশকে ফুটবল বিশ্বকাপ এনে দিচ্ছেন, সেসময়ের একটা বিখ্যাত ফোটোতে দেখা গিয়েছিল, ইনিয়েস্তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন বিপক্ষ দলের ছ'জন খেলোয়াড়। স্পেনের জাতীয় দলেই হোক আর বার্সেলোনায়, দলের মেরুদণ্ড যে ছিলেন ইনিয়েস্তাই, সেকথা বোঝাতে ছবিটা ছিল প্রতীকী। বার্সেলোনার তিন মূর্তি মেসি-নেমার-ইনিয়েস্তার দুই মূর্তি মেসি আর নেমারের উত্থানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা তৃতীয়জনেরই। স্পেনের আর-এক কিংবদন্তি ফুটবলার জ়াভির সঙ্গে ইনিয়েস্তার পারস্পরিক যে বোঝাপড়া, অন্তত বার্সেলোনায় এর পর দেখা যাবে না সেটাও। কারণ আক্ষরিক অর্থেই একটা যুগের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি ইনিয়েস্তা ঘোষণা করলেন বার্সেলোনা থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত। দলের প্রতি ভালবাসা এতটাই তীব্র যে অবসর ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই ইনিয়েস্তা জানিয়ে দিয়েছেন, ইউরোপের অন্য কোনও দলের হয়েই কোনওদিন মাঠে নামবেন না। তেমনটা হলে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হয় যে! খেলোয়াড় হওয়া মানে যে শুধু শারীরিক-মানসিক কসরত নয়, বরং তীব্র আবেগও, ইনিয়েস্তা যেতে-যেতে যেন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন সেকথাই।

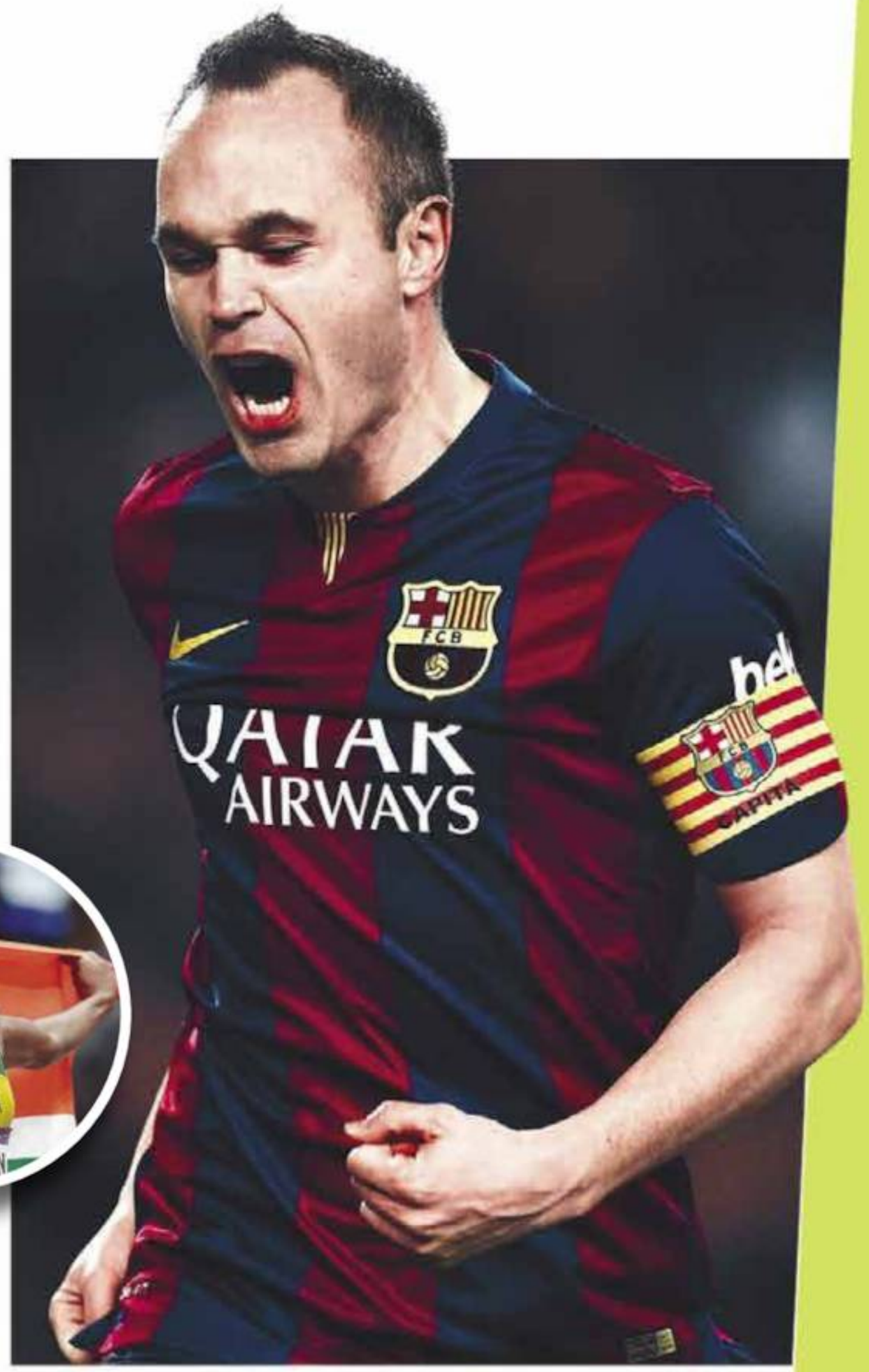

সেমেনিয়ার জোড়া সোনা

ট্র্যাকে নেমে তিনি সোনা জিতলেই ওঠে প্রশ্ন। শুরু হয়ে যায় তাঁকে নিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের বিতর্ক। এবারও হয়েছে। তবু থামানো যায়নি তাঁকে। কমনওয়েলথ গেমসে ৮০০ মিটারের পর ১৫০০ মিটারে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ২৭ বছরের স্প্রিন্টার কাস্টার সেমেনিয়া। অলিম্পিক্স ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের মালিক সেমেনিয়াকে নিয়ে বিতর্কের শুরু ২০০৯-এর বার্লিন বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের সময়। এই কারণে তাঁকে কিছুদিন নির্বাসনেও থাকতে হয়েছিল। দিতে হয়েছিল শারীরিক পরীক্ষাও। তবুও লড়াই থামেনি তাঁর। এবার আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের নতুন কিছু নিয়মের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে তাঁকে।

ঝুলনের নামে ডাকটিকিট

ফোটো: লেখক

বাংলার মহিলা ক্রিকেটের আইকন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বায়োপিক, 'চাকদহ এক্সপ্রেস'। এবার বিশ্বের অন্যতম সেরা মহিলা অলরাউন্ডার ঝুলন গোস্বামীকে নিয়ে প্রকাশিত হল ডাকটিকিট। কলকাতার ময়দানে ক্রীড়াসাংবাদিক ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে কলকাতা ডাক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত এই ডাকটিকিটটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটালেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "খুবই মহৎ উদ্যোগ। বাংলার মেয়ে ঝুলনের জন্য গর্ব হচ্ছে। ভারতীয় ডাক বিভাগকে ধন্যবাদ।" ডাকটিকিটটি হাতে নিয়ে আপ্লুত ঝুলন বললেন, "ছেলেবেলায় ডাকটিকিট জমানোর শখ ছিল। ঠাকুরমার কাছে পাওয়া ১৯৪২ সালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ডাকটিকিট আমার সংগ্রহে আছে। নিজের নামে ডাকটিকিট হাতে পেয়ে শখটা হয়তো আবার শুরু হয়ে যাবে।" অনুষ্ঠানে ছিলেন নাইজিরিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপার এমেকা এজুগো। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম দুশো উইকেট নেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানেই ঝুলনকে সংবর্ধনা দেয় ভিশন অফ বেঙ্গল।

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

১			
২			
৩			
৪			

ম	খ	ম	ল
হা	তা	হা	তি
কা	না	মা	ছি
শ	র	ব	ত

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত : অনেকে একসঙ্গে কথা বললে যা তৈরি হয়।

৫ এপ্রিল সংখ্যার সমাধান:

ম হা কা শ

Go Figure

÷	x	+	–

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ২৯

৯	২	৩	৪

মাঝামাঝি

							= ৬৮

৪	৮	৫	৩

কঠিন

							= ৯১

৫	৬৫	৪২	৬

৫ এপ্রিল সংখ্যার সমাধান:

সহজ:২২ + ২ – (৩ × ২) = ১৮

মাঝামাঝি: (১২ ÷ ৪) – (৩২ ÷ ১৬) = ১

কঠিন:(৪ × ১১ - ১৪) ÷ ৫ = ৬

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২৮ মে-র মধ্যে পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

সায়ন বিশ্বাস, *সপ্তম শ্রেণি, তাহেরপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়।* **ঈশা পাঠক**, *সপ্তম শ্রেণি, ঝিলিমিলি হাই স্কুল, বাঁকুড়া।* **দীপন পালিত**, *চতুর্থ শ্রেণি, বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা, কলকাতা।* **চয়নেশ ভূঞ্যা**, *সপ্তম শ্রেণি, কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন, পূর্ব মেদিনীপুর।* **আসিফ মণ্ডল**, *অষ্টম শ্রেণি, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, বাণীপুর, হাবড়া।* **সুশ্রী দে চৌধুরী**, *অষ্টম শ্রেণি, রাজপুর পদ্মমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।* **শ্রুতকীর্তি দাস**, *সপ্তম শ্রেণি, সাঁকরাইল গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া।* **সুশোভন পাল**, *অষ্টম শ্রেণি, বীরভূম জেলা স্কুল, বীরভূম।* **তরুমন ঠাকুর**, *অষ্টম শ্রেণি, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, হুগলি।* **স্পন্দন চক্রবর্তী**, *সপ্তম শ্রেণি, কোচবিহার রামভোলা উচ্চ বিদ্যালয়, কোচবিহার।*

Dr. G. P. Sarkar
Medical Researcher
Product Formulator &
Developer since 1969
He is a self-made 1st Generation Industrialist
Founder Chairman
Allen *Group of Companies*

চুল পড়া, অকালপক্কতা, খুশকি?

চুলের কোনোও রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র

তাই চুলের সব সমস্যার সমাধানে - অ্যালেন্স 4 হোমিও মেডিকামেন্টস্

আর্নিকাপ্লাস, ট্রায়োফার, আর্নিকাপ্লাস-এস ও আনিকাপ্লাস অয়েল

Dr. Sarkar Allen's Homoeo COMPREHENSIVE Hair Care & Treatment

Dr. Sarkar is one of the first few to propound the concept that the root causes of chronic hair problems are not only superficial but also deep rooted in liver & stomach ailments. His outstanding research establishes that Excessive Hair Loss, Premature Greying, Dandruff are not diseases of hair itself, but in most cases external manifestations of internal disorders and therefore require two pronged treatment to combat hair problems externally as well as internally. So external application of **ArnicaPlus** Hair Root Vitalizer along with oral medication of **TRIOFER** tablet acts as Triple Action Hair Root Vitalizer to eradicate the root causes of Hair Problems. Keep Scalp & Hair clean and Dandruff free, use **ArnicaPlus-S** Anti-dandruff Hair & Scalp cleanser. Regular use of **ArnicaPlus Oil** Hair Root Nourisher, provides Nutrients and Nourishment to the hair roots & shafts thus maintains Smooth, Healthy & Lustrous Hair.

আর্নিকাপ্লাস ট্রায়োফার

ট্রিপল অ্যাকশন হেয়ার রুট ভাইট্যালাইজার

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর মজবুত চুল উপহার দেয়

- চুল পড়া কমাতে
- নতুন চুল গজাতে
- অকালপক্কতা রোধে
- চুলের গোড়া মজবুত করতে
- খুশকি তাড়াতে ও প্রতিরোধে

ArnicaPlus®
Non-oily, water base Hair Root Vitalizer
হেয়ার রুট ভাইট্যালাইজার চুলের গোড়ায় ম্যাসাজ করুন

TRIOFER Tab.® Oral Homoeopathic Medicine
কেশ সমস্যার মূল কারণগুলি দূর করতে সেবন করুন

Homoeo Medicine Safe & Effective for Men & Women

আর্নিকাপ্লাস ভাইট্যালাইজার ও ট্রায়োফার ট্যাবলেট পৃথক প্যাকেও পাওয়া যায়

খুশকি বিহীন চুলের জন্য আপনার চাই

অ্যালেন্স হোমিওপ্যাথিক মেডিকামেন্ট

আর্নিকাপ্লাস-এস

অ্যান্টিড্যান্ড্রাফ হেয়ার অ্যান্ড স্ক্যাল্প ক্লিনজার

- খুশকি দূর করে
- স্ক্যাল্পের ইনফেক্শন প্রতিরোধ করে

Enriched with Imported Arnica Montana, Resorcinol, Selenium etc.

খুশকি বিহীন ভালো চুলের জন্য

মসৃণ চুলের জন্য আপনার চাই

অ্যালেন্স হোমিওপ্যাথিক মেডিকামেন্ট

আর্নিকাপ্লাস অয়েল

স্ক্যাল্প অ্যান্ড হেয়ার রুট নারিশার

- চুলের গোড়া শক্ত ও মজবুত করে
- দূর্বল চুলের যত্ন নেয়
- চুলের মসৃণতা বাড়ায়
- চুল পড়া কমায়

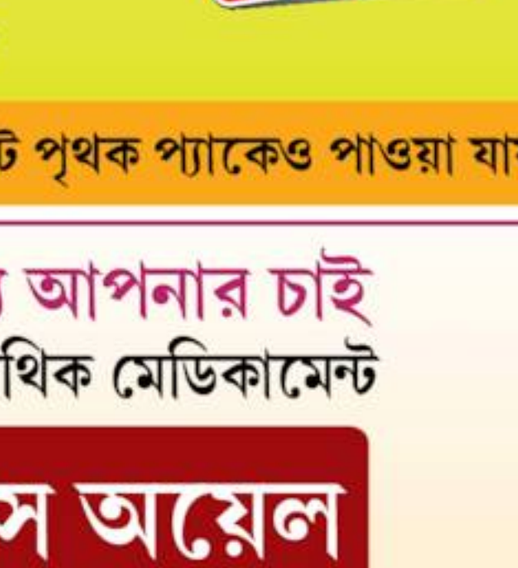

Enriched with Imported Arnica Montana

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মসৃণ চুলের জন্য

HOMOEOPATHIC MEDICINES can be stored under Allopathic Drugs Selling Licence in Form 20-C to sale in the original sealed pack vide The Gazette of India No. 918 dated 10th November 2017

Dr. Sarkar Allen GROUP

Allen Laboratories Ltd.
Medical Help Line : 1800 345 2210 (Toll Free)

সমস্ত মেডিকেল স্টোরস্-এ পাওয়া যায়।